তপন চরিত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

অন্নপূর্ণা প্রকাশনী
৬৬, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ দাস
৩৬, কলেজ রো
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ রথযাত্রা ১৩৬৭

দ : গৌতম রায়

মুদ্রাকর : শ্রীবিজয়চন্দ্র চন্দ্র
শ্রীজগদ্ধ নী প্রেস
৫/২, শিবকৃ লেন
কলিকাতা-৭

সূচীপত্র



গান শোনাবার নিমন্ত্রণ

তপনকে সিগারেট খেতে শিখিয়ে নিজেই হাত কামড়াচ্ছি।

গোড়াতে ভেবেছিলুম—সব ভদ্র সন্তানই যেমন ভেবে থাকে—তপন একবার সিগারেট ধরুক, তারপর ওকে আমিই চেপে ধরব। কিন্তু এমনিতে যত দিল-দরিয়াই হোক, সিগারেট কিনতে বললেই ওর জবাব: দূ-দ্দূর, পয়সা দিয়ে ধোঁয়া কিনে খাব?

তার মানে আমি যে সিগারেট কিনছি তাতে পয়সা খরচ হচ্ছে না। অন্তত ওর যে হচ্ছে না—তাতে আর সন্দেহ কী!

সঙ্গে যখন থাকে, তখন আমি একটা প্যাকেট কিনলে তার সাতটাই ও উড়িয়ে দেবে। শেষে বিরক্ত হয়ে বলেছিলুম, ভাই তপন, ডাক্তারেরা বলেছেন সিগারেট খাওয়া খুব খারাপ। ওতে ক্যানসার হয়।

—তুমি যে খাচ্ছ বড়ো?

আমি তখন খুব উদাস হয়ে গিয়েছিলুম। চোখ দুটোকে অত্যন্ত ভাবুকের মতো করে চেয়েছিলুম নিশ্চয়, কিন্তু তখন নিজের চোখ আমি দেখতে পাইনি, গভীর গলায় বলেছিলুম, আমার জন্যে ভেবো না ভাই। আমি মারা গেলে পৃথিবীতে কার কী আসে যায়! দেখতেই পাচ্ছ, ব্যাঙ্কে চাকরি করি। হাজারে হাজারে পরের টাকার হিসেব লিখছি অথচ, নিজের বেলায়—! এমন একটা থার্ডক্লাস জীবনের কোনো মানে হয়? অথচ তোমার মূল্যবান জীবন—

তপন বলেছিল, আমিও তো ব্যা-ব্যা—

—না ভাই, আমি আপত্তি করছি। তুমি কোন্ দুঃখে ব্যা-ব্যা করবে?

—ধুত্তোর! ব্যা-ব্যা নয়—ব্যা-ব্যা—অ্যাঙ্ক! আমিও তো সেই কী বলে—সেই ব্যা-ব্যা—চুলোয় যাক, চাকরি করি। কাজেই

এক সঙ্গেই না হয় ক্যা-ক্যা-ক্যা—

ওর 'ক্যা-ক্যা' জিজ্ঞাসার সঙ্গে আমাকেই 'অ্যানসার'টা জুড়ে দিতে হয়েছিল—কী আর করা! কিন্তু এটা বেশ বুঝতে পেরেছিলুম, তপন আমার সিগারেট খাবেই এবং সেজন্যে আমার সঙ্গে সহমরণে যেতে পর্যন্ত প্রস্তুত আছে।

রবিবার সকালে মেসের চাকরকে দিয়ে সবে এক বাক্স সিগারেট আনিয়েছি এবং একটা ধরিয়েছি—সঙ্গে সঙ্গে এক গাল হাসি নিয়ে তপনের প্রবেশ। কী করে যে টের পায়—আশ্চর্য!

চকিতে মাথার ভেতরে একটা পরিষ্কার পরিকল্পনা এসে গেল। তপন ঘরে ঢুকতেই বেশ কায়দা করে সিগারেট প্যাকেটটা ছুঁড়ে দিলুম ঘরের কোণায়। বললুম, যাঃ—ফুরিয়ে গেল!

—বটে—তাই নাকি? তা হলে খালি প্যাকেটটাই আমি নিই, কী বলো?—তপনের হাসি কান পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল: ব্রাদার, আমার সঙ্গে চালাকি? খালি প্যাকেটে কখনো অমন চপ করে শব্দ হয়?

বিষাক্ত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখলুম, ঠিক কুড়িয়ে নিয়েছে।

ব্যাজার হয়ে ভাবছি, ছুঁচোবাজীর বারুদ মিশিয়ে ওর জন্যে একটা স্পেশ্যাল সিগারেট তৈরী করা যায় কিনা—তপন এসে আমার পাশে বসে পড়ল। ডাকল, সুকুমার?

—হুঁ।

—সুকুমার, শুনছ?

—শুনব না কেন?—তপনের পকেট থেকে বিদ্যুৎ বেগে আমি প্যাকেটটা পুনরুদ্ধার করলুম: দেখতেই তো পাচ্ছ—নাকের দু দিকে ব্যালান্স করে একজোড়া বড়ো বড়ো কান খাড়া হয়ে আছে।

—আছে নাকি?—তপন হ্যা হ্যা করে হাসল: আমি ভেবেছিলুম দুটোই কাটা গেছে বোধ হয়।

রসিকতা। পিত্তি পর্যন্ত জ্বলে গেল আমার। গম্ভীর হয়ে বললুম, বাজে কথা থাক। কিছু বলবার থাকলে বলো।

—বলতেই তো এসেছি, কিন্তু তুমি এমন ছোটলোক হয়ে গেছ যে একটা সি-সি-সি—তপন একেবারে ছি-ছি করতে লাগল।

তারপর গোটা কয়েক লম্বা লম্বা টানে সিগারেটটা শেষ করে বললে, গান শুনবে ?

—তুমিই শোনাতে চাও নাকি ?—আমার রোমাঞ্চ হলো : একবার আর্টিস্ট হয়ে তুমি আমার পিলে চমকে দিয়েছিলে, গান শোনালে—মানে টু বি ভেরী ফ্র্যাঙ্ক—ক্যানসার হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা আমায় নাও করতে হতে পারে !

—শাট আপ !—তপন চটে গেল : আমি গান শোনাব কেন ? শোনাবেন আমার পা—পা—পা—

—তোমার পা শোনাবেন, তোমার পা কি গান গাইতে পারেন ? শুধু তোমার কেন, পৃথিবীর কোনো পদমর্যাদাসম্পন্ন লোকের পায়েরই কি গান গাওয়া সম্ভব ?

আমার সংশয় তপনকে জানাতে হলো।

—আঃ ইয়ার্কি নয় সুকুমার। গান শোনাবেন পা—পারুল পিসিমা।

যাক, এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল।

--কিন্তু তোমার পারুল পিসিমা আমাকে গান শোনাবেন কেন ? আমাকে তো চেনেন না।

—তোমাকে ঠিক চেনেন না বটে—সরু গোঁফের ভেতর থেকে তপন মিটমিট করে হাসল : কিন্তু কী একটা গল্প—মানে মধ্যে মধ্যে কাগজপত্রে যেসব রাবিশ তোমার ছাপা হয়, তারই একটা পড়ে দারুণ উত্তেজিত হয়েছেন। তাতে তুমি গান সম্বন্ধে কী যেন লিখেছিলে, পিসিমা বলেছেন, লোকটি দারুণ গুণী—একে আমি গান শোনাব। শুনে বেশ খানিকটা উৎসাহ এল বটে কিন্তু

সন্দেহ গেল না।

—ইয়ে—কী বলে, কিছু মনে কোরো না ভাই—তোমার পিসিমা—মানে সেই রকম গান করেন না তো—যা শুনে প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করে, উর্ধ্বশ্বাসে লোকে—

—আরে না—না! পা-পা-পারুল পিসিমা চমৎকার গাইতে পারেন, কীর্তন, ভ-ভজন, বাউল—সবগুলোতে এক্সপার্ট। বাইশটা মেডেল আছে, তার তিনটে অবিশ্যি টিনের।

—টিনের? টিনের কেন?

—আরে সব জো—জো—জো মানে চোর। রুপোর বলে চালিয়ে দিয়েছে—তপনের মুখে ধিক্কার ফুটে বেরুল: কাউকে বিশ্বাস করতে আছে নাকি দুনিয়ায়? মরুক গে, আজ বিকেলে তোমার গান শোনা আর 'হাই টী' খাবার নেমন্তন্ন।

—হাই টী?—আমি কান খাড়া করলুম।

—হুঁ। চায়ের সঙ্গে গরম কাটলেট, মাংসের সিঙাড়া, পুডিং—

আর বলতে হলো না—আমার আপাদ-মস্তকে শিহরণ জাগল। মেসে কী খেয়ে না দিন কাটছে। 'হাই টী'র প্রস্তাব শুনেই আমার মনের ভেতর 'ট্রা-লা-লালা' করে একটা বিলিতী গান গুনগুন করে উঠল।

—আলবাত। তবে তো যেতেই হয়। এমন গান শোনবার সুযোগ কিছুতে ছাড়া যায় না।—তপন এর ভেতরেই আবার আমার সিগারেটের প্যাকেটটা দখল করেছে, কিন্তু দেখেও আমি দেখতে পেলুম না: কখন যেতে হবে—কোথায় যেতে হবে?

—পাঁচটায়। সে আমি এসে তোমায় নিয়ে যাব। তুমি কোনো চি-চি-চি—

—না—না, আমি কোনো রকম চিঁচিঁ করব না। যা করবার তুমিই করো।

তপন একটু চুপ করে রইল। তারপর বললে, শুধু একটা

কথা আছে ভাই। যাওয়ার সময় কিছু চকোলেট-টফি—এসব নিয়ে যেয়ো।

—চকোলেট-টফি?—আমি আশ্চর্য হলুম: কেন, পিসিমাকে প্যালা দিতে হবে নাকি?

—ধুৎ, পিসিমা প্যা—প্যা—মানে নেবেন কেন? আমার দুটি পিসতুতো ভাই আছে, একটার পাঁচ বছর আর একটার সাত। ওরা একটু ওগুলো ভালোবাসে, মানে চায়-টায়। সত্যি বলতে কি ভাই, পিসিমার গান ভালো, খাওয়ানও ভালো, কিন্তু ওদের জন্যেই পিসিমার বাড়িতে আমার যেতে ইচ্ছে করে না।

তপনের 'মীননেস' দেখে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে গেল, ওর হাত থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা কেড়ে নিলুম আমি। দুটি শিশু—কবি যাদের সম্পর্কে বলেছেন "নন্দনের এনেছে সংবাদ—ইহাদের করো আশীর্বাদ"—তাদের দুটো চকোলেট কিনে দিতেও তপনের মন খারাপ হয়ে যায়! তার ওপর আবার পিসতুতো ভাই! ঠিক করলুম, এর পরে ওর কাছ থেকে আমি সিগারেটের দাম আদায় করব।

বললুম, তুমি তো আচ্ছা ছোটলোক হে! দুটো বাচ্চা—আহা—হাই টীর কথা মনে পড়তে আমার স্বর আরো মধুমাখা হয়ে উঠতে লাগল: এই তো ওদের চকোলেট খাওয়ার বয়েস! তুমি কি আশা করো ওরা তোমার কাছে চকোলেট না চেয়ে এক কলকে তামাক চাইবে?

তপন সরু গোঁফের ফাঁকে একটু হাসল—বেশ আধ্যাত্মিক রকমের হাসিটা। বললে, আচ্ছা, পাঁচটার সময় আমি আসব। তৈরি থেকো।—তার পরেই খপ করে আমার হাত থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা কেড়ে নিয়ে বললে, এটা খালি প্যাকেট—তুমি ফেলে

দিয়েছিলে। এখন এটা আমার প্র-প্র-প্র—

'প্র-পরা-অপ' ইত্যাকার অবশিষ্ট উপসর্গগুলো অনুচ্চারিত রেখেই তপন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি হাঁ-হুঁ করে ওঠবারও সময় পেলুম না।

তখনই বোঝা উচিত ছিল, গান শোনানো আর হাই টী খাওয়ানোর ভেতরে নির্ঘাৎ একটা প্যাঁচ আছে কোথাও। যে রকম বিচ্ছিরি দিনকাল, তাতে খামোকা কেউ কাউকে গান শুনিয়ে পুডিং কাটলেট খাওয়ায় না। আমার মামাতো ভাই নগেনদাকে একবার ট্রাম গাড়িতে পাশের লোকটি একটা মস্ত গোলাপ দিয়ে বলেছিল, পেশোয়ারী গোলাপ স্যার—আপনাকে প্রেজেন্ট করলুম। হাসি-হাসি মুখে নগেনদা বিভোর হয়ে পেশোয়ারী গোলাপ শুঁকছেন, সেই ফাঁকে লোকটা তার পকেট মেরে দুশো টাকা সুদ্ধু মনিব্যাগটা নিয়ে পালিয়ে গেল!

আপাতত নগেনদার সেই করুণ কাহিনীটা বার বার মনে পড়ছে আমার।

পিসেমশাই চা বাগানের ম্যানেজার, অবস্থা তাঁর ভালোই দেখা গেল। জাঁকালো বাড়ি, সামনে মস্ত বাগান। গেট পেরিয়ে যেই ঢুকেছি, অমনি দুটি গোলগাল আহ্লাদে চেহারার ছেলে প্রায় মার মার করে তেড়ে এল আমাদের দিকে।

—পোকাদা এসেছে --পোকাদা—

তপন চৌধুরীর 'পোকাদা' বলে একটি মনোরম নাম আছে, এই তথ্যটি অবগত হয়ে মন পুলকিত হলো। এবং ছারপোকা কিংবা গুবরে পোকা কোনটার সঙ্গে ওর বেশী সাদৃশ্য আছে সেটা বোঝবার চেষ্টা করছি, এমন সময়—

তপন হাঁ-হাঁ করে উঠল: আমি নয়—আমি নয়—ওর কাছে

—ওকে ধরো—

ওর কাছে? কার কাছে? কাকে ধরবে এবং কেনই বা ধরবে? এতগুলো জটিল জিনিস এক সঙ্গে অনুধাবন করবার আগেই সেই শিশু দুটি তৎক্ষণাৎ আমাকে আক্রমণ করল। এক-জন আমার পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে উঠে বাঁ পকেটটাকে হাতড়াতে লাগল, আর একজন ডান পকেট থেকে টফির ঠোঙাটা বের করে নিয়ে তীরবেগে ছুট লাগালো।

প্রথমটি তখন পকেট থেকে রুমাল, চাবি, দু চার আনা খুচরো পয়সা—সব মুঠো করে ছুঁড়ে ফেলছিল। আত্মরক্ষার জন্যে একটা চড় প্রায় তুলে ফেলেছি—এমন সময় আর একজনের হাতে ঠোঙাটা দেখেই সে তাড়া করল তাকে। পরের অধ্যায়টা আর জানা গেল না, কারণ দুজনেই ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে।

খানিকক্ষণ হাঁ করে থেকে আমি বললুম, তা হলে এরাই—

বিষণ্ণভাবে মাথা নাড়ল তপন।

—হুঁ, এরাই। গাবু আর টাবু। ভগবানের স্-স্-স্পে-পে—

—স্পেশ্যাল—

—ক-কর-ক্রিয়েশন!

মাটি থেকে রুমাল-চাবি কুড়িয়ে নিয়ে পয়সাগুলো খুঁজতে খুঁজতে বললুম, টফিগুলো হাতে করে দেবার তরও সইল না দেখছি। একটু ক্ষুধিত ছিল মনে হচ্ছে।

—ক্ষুধিত? এরা সব সময়ই ক্ষুধিত থাকে। যাকে বলে মহাবুভুক্ষা।

—আমার পাঞ্জাবীর পকেটটা একটু ছিঁড়েও দিয়েছে হে।

—আর আমার ক'টা ছিঁড়েছে, জানো?—সরু গোঁফের ফাঁকে তপন মিটমিট করে হাসল: বা-বারোটা।

—অ্যাঁ!—নিদারুণ আতঙ্কে আমি আর্তনাদ করি: বলো কি হে, শেষ পর্যন্ত ভদ্র পোশাকে ফিরতে পারব তো?

—ভ-ভগবানকে ডাকো।

—তার মানে?—আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে গেল: তুমি কি বলতে চাও—

ও যে কী বলতে চায় সেটা আপাতত জানা গেল না। কারণ পারুল পিসিমা এসে পড়লেন। আর তাঁর পিছনে টাক মাথা যে বেঁটে-খাটো ভদ্রলোক গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে এলেন, তাকে পিসেমশাই বলেই সন্দেহ হলো আমার।

—গাবু-টাবু এসেছিল বুঝি?—পারুল পিসিমার গোলগাল মুখ থেকে স্বর্গীয় বাৎসল্য উছলে পড়ল: ছেলে দুটোর ভারী মায়ার প্রাণ। লোকজন দেখলে তক্ষুনি ছুটে আসে।

—আর দেখতে দেখতে আপন করে নেয়।—পিসেমশাই সস্নেহে সংযোজন করলেন।

আর পত্রপাঠ পকেট মারে—এইটে বলতে গিয়েও আমাকে সামলে নিতে হলো।

তখন পিসিমার দৃষ্টি আমার ওপর গিয়ে পড়ল।

—তুমিই তো সুকুমার?

করজোড়ে বললুম, আজ্ঞে।

পারুল পিসিমা কিছুক্ষণ মুগ্ধ চোখে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তোমার 'আলো ঝলমল সন্ধ্যা' বলে একটা গল্প পড়ে আমি রীতিমতো স্তম্ভিত হয়ে গেছি। তুমি লিখেছ: মুন্নু মিঞা তখন মনের খুশিতে চৌতালে একখানা দিলরুবা গাইছিল।' চৌতালে দিলরুবা গাওয়া যায় এ কথা কে কবে ভেবেছিল!

পিসেমশাই বললেন, আর দিলরুবা বলে একটা সুর আছে—একথাই বা কে কবে শুনেছে। আমরা জানতুম ওটা একরকম বাজনা।

পিসিমা বললেন, ভেবে দেখো, আমরা কত কম জানতুম!

আর পিসেমশাই বললেন, আরো ভেবে দেখো, গল্প লেখকেরা

আমাদের চাইতে কত বেশি জানেন!—আবেগে পিসেমশাইয়ের টাকটা পর্যন্ত চকচক করতে লাগল।

ওঁদের এই ভাবনার প্রতিযোগিতায় আমার কি রকম অস্বস্তি লাগতে লাগল। প্রায় বলতে যাচ্ছি, দিলরুবা এক রকমের জাপানী গজল—পিসে মশাই-ই বাধা দিলেন বললেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি আর কথা হয়? চলো-চলো—ভেতরে চলো—

ভেতরে পা বাড়াতে আমার ঠিক সাহস হচ্ছিল না—সেই 'মায়ার প্রাণ' ছেলে দুটির পুনরাক্রমণের সম্ভাবনায় শিহরণ জাগছিল সর্বাঙ্গে। কিন্তু এখন আর ফেরা যায় না। তা ছাড়া তৎক্ষণাৎ 'হাই টী'র কথাও মনে পড়ে গেল। আর পিসিমার গোলগাল হাসি হাসি মুখখানা দেখে এমনও সন্দেহ হচ্ছিল যে পুডিং-কাটলেটের ব্যাপারটাও নেহাত মন্দ জমবে না।

শুধু তপনকে একবার বললুম, ভাই পোকাদা—

হাঁড়ির মতো মুখ করে তপন বললে, এগোও!

তা হলে এগোই। কবিগুরু বলেছেন, 'নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড়' ইত্যাদি। কী 'রবে আর রবে না'—সেটা এখনো জোর করে বলা মুশকিল। কারণ সেই শিশু দুটির আর একবার আবির্ভাব ঘটলে জামা-টামা আস্ত নিয়ে ফেরা যাবে কি না, সে ব্যাপারে এখনো নিঃসন্দেহ হওয়া যাচ্ছে না। মনকে ভরসা দিয়ে বললুম, ঠোঙায় আধ পাউণ্ড টফি ছিল—সেগুলো শেষ করে আনতেও তো সময় লাগবে!

পিসিমা আর পিসেমশাই আমাদের ড্রয়িংরুমে নিয়ে এলেন। সোফা চেয়ার নেই—ঢালাও ফরাস পাতা। সঙ্গীত শিল্পীর ঘর যেমন হয়ে থাকে। কোণায় ঠেসান দেওয়া তানপুরা, ফরাসে হারমোনিয়াম আর বাঁয়াতবলা। শিশু দুটিকে কাছাকাছি দেখা গেল না—গানের আসরে এসে বিরক্ত করবে না বলেই ভরসা হলো।

বোসো—বোসো—বলে পিসিমা ধাঁ করে নিজেই বসে পড়লেন এবং তৎক্ষণাৎ হার্মোনিয়াম টেনে নিলেন। আর পিসেমশাইকেও তবলা-বাঁয়ার পাশে আসন নিতে দেখা গেল।

তপন আমার কানে কানে বললে, পিসেমশাই খুব ভালো তবলচী।

অর্থাৎ একজন সঙ্গীত করেন, আর একজন সঙ্গত। আদর্শ জীবন সঙ্গী একেই বলে—এরই নাম সঙ্গদান।

পিসিমা বললেন, মুশকিল কি জানো সুকুমার, দেশে সমঝদার নেই। এত ভালো গান শিখেছি আমি—বাইশটা মেডেল আছে আমার (আমার মনে পড়ল, তার তিনটে টিনের)—তবুও শোনাবার লোক পাওয়া যায় না। শহরের লোকগুলো যে এত বেরসিক কী বলব! এই পোকাটা (তপনের মুখটা বিচ্ছিরি হয়ে গেল) আগে তবু মাঝে মাঝে আসত, এখন ওর টিকিও দেখবার জো নেই। কিন্তু বিদ্যেটা যখন শিখেইছি, তখন লোককে না শোনালে কি ভালো লাগে? তুমিই বলো!

—আজ্ঞে হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন।

হার্মোনিয়ামের একটা রীড টিপতে টিপতে পিসিমা বললেন, তা হলে চা-টা কি এখুনি খাবে? না গান শুনে—

অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে বলতে যাচ্ছিলুম, মন্দ কী, হয়ে যাক না—কিন্তু পিসেমশাই বাগড়া দিলেন। একটা ছোট হাতুড়ি দিয়ে তবলার কী সব ঠুকছিলেন, বললেন, আরে না—না, চায়ের জন্য ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সুকুমার কি রকম গুণী ছেলে দেখতে পাচ্ছ না? ও চৌতালে দিলরুবা গাইতে পারে—তুচ্ছ চায়ের জন্যে এসেছে নাকি এখানে? চা না হলেই বা কি আসে যায় ওর? গানই হচ্ছে আসল কথা—তার টানেই তো এমন করে ছুটে এসেছে!

কী সর্বনাশ! চা না হলেই বা কী আসে যায়? এমন বিপজ্জনক সম্ভাবনার জন্যে কে তৈরী ছিল! আধ পাউণ্ড টফি

বিনি-পয়সায় পাওয়া যায়নি, গাবু-টাবুর জন্যে নিজের ভবিষ্যৎ এখনো অনিশ্চিত, একমাত্র ভরসা হাই-টীও বরবাদ হবে নাকি শেষ পর্যন্ত? আমি তপনের কানে কানে কাতরস্বরে বললুম, ভাই পোকাদা—

তপন দাঁত খিঁচিয়ে বললে, শাট আপ!

পিসিমা জিজ্ঞেস করলেন, কী বলছ?

—কিছু না—কিছু না!—তপন জানালো। সুকুমার বলছে, চা না হলেও ওর চলবে—গা-গা—গানই হোক!

কী বিশ্বাসঘাতক। পোকাদা বলে ডেকেছি বলেই কি এ রকম প্রতিহিংসা নিতে হয়? আমি তারস্বরে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তার আগেই পিসিমা গান ধরলেন। ভজন। আর পিসেমশাই পত্রপাঠ বাঁয়া-তবলাকে আক্রমণ করলেন।

গান-টান আমার কাছে গ্রীক ভাষার চাইতেও জটিল, কিন্তু মিনিট কয়েক শুনে মনে হলো, পিসিমা ভালোই গান। মিষ্টি দরাজ গলা—অনেকদিন ধরে সাধনা করেছেন বোঝা যায়। আরো মনে হলো পেট ভরা থাকলে ঘণ্টা দুই তাঁর গান শোনা আমার পক্ষেও নেহাত অসাধ্য ব্যাপার নয়। হাই-টীর কথা ভুলে গিয়ে আমিও একটু জমে উঠেছি, তালে তালে মাথা নড়ছে, এমন সময়—

দ্রুত গাবু ও টাবু অকুস্থলে প্রবেশ করল। ডাকল: পোকাদা—পোকাদা—

তপন আগে থেকেই তৈরি হয়ে ছিল।

—আমি নয়—আমি নয়—এই সুকুমারকে ধর—

তার নিজের ভূত দুটিকে পত্রপাঠ আমার দিকে চালান করল সে।

গাবু এবং টাবু—কোন্‌টির কী নাম কে বলতে পারে, একটি ধপাৎ করে আমার কোলে বসে পড়ল, আর অবিলম্বে দু পাশের পকেট সন্ধান করতে লাগল। দ্বিতীয়টি আমার কাঁধের ওপর দাঁড়ের ময়নার মতো অধিষ্ঠিত হল এবং আমার বুক পকেটে হাত

ঢুকিয়ে দিলে।

আর সমস্বরে শোনা গেল : চকোলেট—চকোলেট—

—এখন নেই, পরে কিনে দেব—ক্ষীণকণ্ঠে বক্তব্য জানিয়ে আমি গাবু-টাবুর হাত থেকে নিস্তার পাবার চেষ্টা করতে লাগলুম। ফলে কোলেরটি আরো ভালো করে গদিয়ান হয়ে বসল এবং কাঁধেরটি বেশ শক্ত হাতে আমার চুলগুলো আঁকড়ে ধরল। খুব আরাম বোধ করলুম না—বলাই বাহুল্য !

—আছে চকোলেট, তুমি লুকিয়ে রেখেছ—বলে একজন আবার দু পকেটের সর্বস্ব চারদিকে ছড়িয়ে ফেলতে লাগল আর সিগারেটের প্যাকেটটা বেরুবা মাত্রই বিদ্যুৎগতিতে সেটাকে হাতিয়ে ফেলল তপন। দ্বিতীয়জন আমার কাঁধের ময়ূর সিংহাসনে আসীন থেকে টপ করে চশমা জোড়া খুলে নিলে।

—আহা-হা, করছ কী, চশমা দাও—চশমা দাও—

পারুল পিসিমা বিভোর হয়ে গান গাইছেন—এ সব তুচ্ছ ব্যাপার তিনি দেখতেও পেলেন না। পিসেমশাই তবলা বাজাতে বাজাতে এক ঝলক মধুর হাসি বিতরণ করলেন আমার দিকে। অর্থাৎ যেন বলতে চাইলেন :

তোমাকে কত ভালোবাসে দেখে নাও একবার।

—চশমা দাও বলছি—

—চকোলেট্‌ দাও তবে—বলেই আমার বাঁ কানে পুটুস করে চিম্‌টি কাটল।

আর একজন এবার দাঁড়িয়ে পড়ল। পা ভর্তি ধুলো—আমার কাপড়জামা তচ্‌নচ্‌ করে দিয়ে ধাঁই করে নাকের নিচে খাম্‌চি দিলে একটা। বললে তোমার গোঁফ নেই কেন ?

স্কন্ধাসীনটি এবার ঝট্‌ করে পকেটের ফাউন্টেন পেনটা তুলে নিয়ে বললে, জানিস, ওর গোঁফ শেয়ালে খেয়ে নিয়েছে।

দুটি নন্দনের শিশু পরম পুলকে হেসে উঠল। এমনকি

পিসেমশাই পর্যন্ত মিট মিট করে হাসলেন তাই শুনে। বাৎসল্য রসে চোখ ছুটি চিকচিক করতে লাগল তাঁর।

কংস অত্যন্ত খারাপ লোক ছিলেন, তিনি পত্রপাঠ ভাগ্নেদের সংহার করে বসতেন। কিন্তু এই বালক ছুটির জন্যে একটি কংস মামা জন্মগ্রহণ করলে কি খুব অন্যায় হত সেটা ? কাঁধের শিশুটিকে প্রাণপণে নামাবার চেষ্টা করতে করতে এইসব বীভৎস এবং অন্যায় চিন্তা আমাকে পেয়ে বসতে লাগল। কিন্তু এদের কোনো কংস মামা জন্মাননি এবং কাঁধের ভূত যে ইচ্ছে করলেই নামানো যায় না, সেটা বুঝতেও দেরি লাগল না।

আবার চুলের মুঠিতে আরো শক্ত টান পড়ল, দ্বিতীয় শিশুটি প্রথমটির হাত থেকে আমার চশমাজোড়া সংগ্রহ করে ফেলল, আর আমার ঘাড়ের ওপর কেউ পিন দিয়ে আঁচড়াচ্ছে বলে মনে হলো। অনুমান করা গেল আমারই কলম দিয়ে বোধ হয় কিছু লেখা হচ্ছে ওখানে। কিন্তু ঘাড়টা যে ঠিক বিদ্যাচর্চার জায়গা নয়—এই কথাটা কিছুতেই বোঝানো গেল না। করুণ সুরে বললুম, ভাই তপন—

—আমি তো গোড়াতেই বলেছিলুম।

বলেছিল বটে, কিন্তু একজোড়া মহীরাবণ যে আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, ঘুণাক্ষরেও তো তার আভাস দেয়নি। তাহলে কে আসত এ বাড়ির ত্রিসীমানায়! এতক্ষণে কোনো রহস্য আর আমার অজানা রইল না। পিসিমা ভালোই গান, তবু যে কেন লোকে তাঁর গান শুনতে আসে না, এমনকি হাই-টীর লোভেও নয়—সেটি হাড়ে হাড়ে বোধগম্য হলো আমার।

পারুল পিসিমার ভজন শেষ হলো। একবার তাঁর বংশধরদের দিকে চেয়ে দেখলেন।

—ঘাড়ে উঠেছ কেন টাবু ? নামো।

উত্তরে আমার স্কন্ধ দেশের ওপর থেকে—'ই—কিঁচ—' বলে

শব্দ হল একটা। অনুমান করলুম, টাবু ভেংচি কাটল।

আর পিসেমশাই তেমনি মধুর হেসে বললেন, দেখেছ, আসবার সঙ্গে সঙ্গেই কি রকম ন্যাওটা হয়ে উঠেছে ওর!

এবার পিসিমা বললেন, হুঁ—ওদের খুব মায়ার প্রাণ।—আর বলেই চোখ বুজে কীর্তন ধরলেন। আমার নাভিশ্বাস উঠবে বলে মনে হলো! ঘাড়ের ওপর কলম দিয়ে সমানে বিদ্যাচর্চা হচ্ছে, একজন আমার নাকটাকে খিমচে চলেছে। আর ক্রমাগত শুনতে পাচ্ছি: শীগ্‌গীর চকোলেট দাও—দাও বলছি—

পিসিমা গাইছেন: 'মরিব মরিব সখি, নিশ্চয় মরিব।' আমার মন বলছে—'মারিব—মারিব আমি নিশ্চয় মারিব।' কিন্তু মারবার জো কী। পিসিমা চোখ বুজে আছেন বটে, কিন্তু পিসেমশায় ঠিক লক্ষ্য করছেন আমাকে অথবা তাঁর শিশুদুটিকে। নিজে টিকেট কেনো—মালের উপর নজর রাখ—' রেল কোম্পানির এই আশ্চর্য বাণীটি তিনি মর্মে মর্মে বুঝেছেন বলেই মনে হলো!

ভাবলুম, এইবারে ধূর্জটির মতো উঠে দাঁড়াই—যা হোক একটা প্রলয়-কাণ্ড ঘটে যাক, ঠিক তখন—

দৈববাণীর মতো তপনের কণ্ঠস্বর শোনা গেল: চলে আয় টাবু-গাবু, তোদের চকোলেট কিনে দিই।

—ই—কিঁচ—আমার কাঁধে আনন্দ ধ্বনি উঠল। এক লাফে নেমে পড়ল টাবু, কলমটা কোলের ওপর খসে পড়ল—এক ছোপ কালি লাগল কাপড়ে। আর গাবু আমার চশমাটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ তপনকে অনুসরণ করল।

মুক্তি।

কিন্তু ততক্ষণে আমি বিধ্বস্ত, বিচূর্ণিত—এক কথায় প্রায় নিহত! জামা-কাপড়ের অবস্থা বর্ণনার বাইরে, নাকে মুখে গালে জ্বালাময়ী অনুভূতি, কলমটা দিয়ে আর লেখা যাবে কিনা সন্দেহ, চশমাটা অল্পের জন্যে রক্ষা পেয়েছে। পিসিমা গাইছেন, 'মরিলে ঝুলায়ে

রেখো তমালেরি ডালে'—আমি ভাবছি জীবিত অবস্থায়ও কাউকে ঝোলানো যায় এবং এই মুহূর্তেই ঝোলানো উচিত! কতক্ষণ কাটল জানি না। বোধ হয় মিনিট পাঁচেক বজ্রাহত হয়ে বসে আছি আর সেই ফাঁকে পিসিমা আর একখানা কীর্তন ধরেছেন, ঠিক তখন—

দরজার বাইরে তুটি কচি গলায় 'হা-রে-রে রে' গোছের হাঁক উঠল এবং আমার হৃৎপিণ্ডকে স্তব্ধ করে দিয়ে আবার তুই মহীরাবণ এসে প্রবেশ করল।

এবার শিশুপাল বধ করব—নির্ঘাৎ। একটা চড় তুলে আমি তৈরী হয়ে গেলুম। কিন্তু—

কিন্তু এবার যা ঘটল তা সম্পূর্ণ অভাবিত। তুই শিশুর হাতে তুটি ছোট ছোট পেন নাইফ চিক চিক করে উঠল। একজন চক্ষের পলকে হার্মোনিয়ামের বেলোটি ফাঁসিয়ে দিলে, আর একজনের অস্ত্রাঘাতে বিকট আওয়াজ করে তবলার চামড়া তুভাগ হয়ে গেল!

পারুল পিসিমা আর্তনাদ করলেন, আর পিসেমশাই কয়েক সেকেণ্ড বজ্রাহত হয়ে বসে রইলেন। চোখ ভরা বাৎসল্য স্নেহ এক মুহূর্তে নিদারুণ জিঘাংসায় পরিণত হলো, তুটি সন্তানের কান ধরে বেড়ালছানার মতো শূন্যে তুলে নিলেন, দাঁতে দাঁতে ঘষে বললেন, লক্ষ্মীছাড়া, বাঁদর, আজ তোদের আমি—

আর তপন আমার কানে কানে বললে, সুকুমার কুইক!

কিসের কুইক, কোথায় কুইক—কিছু বলবার দরকার ছিল না। তু জনেই উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে বেরুলুম। দূর থেকে চটাস চটাস করে যতো চাঁটির আওয়াজ আসছে—পিসেমশাই নতুন তুটি বাঁয়া-তবলায় হাত পাকাচ্ছেন নিশ্চয়। রাস্তায় এসে সেই অবস্থাতেই একটা রিকশয় লাফিয়ে উঠলুম আমরা। মিনিট তিনেক গেল দম ফিরে পেতে। তারপর তপন বললে, ভে-ভেনডেটা। তু বছর ধরে

লা-লা-লাইফটা হেল করে দিয়েছিল। আজ বাইরে নিয়ে গিয়ে ত্থু-খানা ছুরি কিনে দিয়ে বলেছি, হা-হার-হার-হার—মরুক গে, আর তবলায় অত মিঠে আওয়াজ বেরোয় কেন জানিস না? ওর ভেতরে অনেক চ-চকোলেট আর লজেন্স লুকোনো থাকে কিনা—তাই। তারপরেই বা-বা-ব্যাস!

হাই-টী জুটলনা, কিন্তু প্রাণটা যে অন্তত বেঁচে গেল, এই কৃতজ্ঞতাতেই তপনের কাছ থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা আমি আর ফেরত চাইতে পারলুম না!



একটি মনোরম দিবস

তপন আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ কটমট করে তাকিয়ে রইল। তারপর প্রশ্ন করল : তোমার ধারণা—তুমি সাহিত্যিক ? কথাটা মর্মে গিয়ে বিঁধল। গোটা কয়েক গল্প লিখে নিজের সম্বন্ধে ধারণাটা জন্মাতে যাচ্ছিল বটে, কিন্তু সম্প্রতি একজন সমালোচক আমার লেখার ওপর আড়াই লাইন মন্তব্য করে জানিয়ে দিয়েছেন যে, কলম ধরাটাই নাকি আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা। তারপর থেকে—

কাতর হয়ে বললুম, না ভাই, না। আমি ওসব উঁচুদরের জীব নই।

তপন একমত হল। বললে, নও যে সে তো দেখতেই পাচ্ছি। তুমি এক নম্বরের অপদার্থ আর আড্ডাবাজ। আসল কথা হচ্ছে, কাল সারাদিন তুমি তাস খেলবে আর সন্ধ্যেবেলা নিশ্চয় হিন্দী ফিলিম দেখতে যাবে। তোমার যদি এতটুকুও ইম্যাজিনেশন থাকত, তা হলে এমন সুযোগ তুমি কিছুতেই ছাড়তে না। পাহাড়ের কোলের ভেতরে একটি ছোট বাংলো—পাশ দিয়ে তার ঝিরিঝিরি ঝরনা—বনের মধ্য থেকে অচিন পাখির ডাক—

কলেজে পড়বার সময় তপনের তোৎলামো ছিল। ক্রিকেটকে বলত : 'কৃ-কৃ-কঃ-রিকেট্', কিন্তু ব্যাঙ্কে একটা ভালো চাকরি পাওয়ার পর ভাষার ওপর ওর বেশ দখল এসেছে দেখা গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলুম, অচিন পাখিরাই বুঝি ডাকাডাকি করে ওখানে ? চেনা পাখিদের বোধ হয় ডাকতে নেই ?

তপন চটে গেল।

—ইয়ারকি করতে হবে না। ইচ্ছে হয় চলো—নইলে আমি একাই যাব। ওখানে প্রচুর বনমুরগী আছে শুনেছি, নিকুঞ্জদার বন্দুকও রয়েছে—

এইবারে আমি আকর্ষণ বোধ করলুম।

—অনেক বনমুরগী আছে বুঝি ? সেগুলো খেতেও নিশ্চয়—

—অদ্ভুত। কিন্তু তোমার তো ওসবে ইণ্টারেস্ট নেই। তুমি পোস্টমাস্টারের ওখানে গিয়ে সারা দুপুর তাসই খেলো। আমি একাই বেরিয়ে পড়ব ভোরের বাসে। আমি তাড়াতাড়ি বললুম, না-না—একটু ঠাট্টা করছিলুম। আমিও যাব। সত্যি বলছি, ভাই, পাহাড়ের কোলে ছোট্ট একটি বাংলো—ঝিরঝিরি ঝরনা, আর কী বলে—ওই। অচিন-পাখির ডাক—ওসব আমার ভালোই লাগে।

এইখানে ব্যাপারটা একটু খুলে বলি।

বছরখানেক হলো, হিমালয়ের কোলের কাছে এই ছোট শহরটিতে বদলি হয়ে এসেছি। এবং যেমন হয়ে থাকে—কিছুদিনের ভেতরেই পাহাড়-জঙ্গলের ওপরে অরুচি ধরে গেছে। অফিসে ছ'টা দিন গাধার খাটুনি—রবিবারের দুপুরে পোস্ট মাস্টারের ওখানে তাসের আড্ডাটার জন্যে মনটা আকুল হয়ে থাকে।

তপন এই শহরেরই ছেলে। কলকাতার কলেজে সহপাঠী ছিল, এখানে এসে আবার দেখা হয়ে গেছে। কোনদিন কবিতা লেখেনি বলে বরাবরই বেশ গভীর ধরনের কবি। বিকেলবেলা গড়ের মাঠে ওর সঙ্গে বেড়াতে গেলে ফিরে আসা শক্ত হয়ে দাঁড়াত। বলত: 'এই সুন্দর সবুজ ঘাস ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না।' আমি একবার জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'এখনো বুঝি তোমার পেট ভরেনি?' তারপর হপ্তা দুয়েক কথাবার্তা বন্ধ ছিল।

কিন্তু চিরকাল এই বনজঙ্গলের দেশে কাটিয়েও অচিন পাখির ডাকে মন উদাস হয়ে যায়—ও যে এত বড় মহাকবি আমার তা জানা ছিল না। ক'দিন ধরে বলছিল, ওর মামাতো ভাই নিকুঞ্জদা নাকি এক আশ্চর্য প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস করেন। ও সেখানে কখনো যায়নি, তবে শুনেছে তার চারদিকে ঘন বন, নীল পাহাড়ের মায়া, গান গাওয়া ঝরনা—ইত্যাদি ইত্যাদি। বলা বাহুল্য যে কোন একটা রবিবারে ও সেখানে যেতে চায় এবং যেহেতু আমি কখনো কখনো দুটো একটা গল্প লিখে থাকি, সুতরাং—

মাসখানেক ধরে নানাভাবে আমি ওকে ঠেকিয়ে রেখেছিলুম। শেষ পর্যন্ত আর পারা গেল না। অচিন পাখির ডাক নয়—বনমুরগীর সম্ভাবনাই আমাকে উদাস করল। মুরগীর অসম্ভব দাম এখানে—গত তিন মাসের ভেতরে রসনার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ঘটেনি। তপন যত খুশি প্রকৃতির শোভা দেখুক, আমি অন্যদিক থেকে পুষিয়ে নেব।

অতএব পরদিন বেরিয়ে পড়া গেল।

বাসে ঘণ্টা দেড়েকের রাস্তা। নামিয়ে দিলে মাঠের মাঝখানে। খবর নিয়ে জানা গেল, প্রায় মাইল দুয়েক হাঁটতে হবে।

—বলো কি তপন, দু মাইল!

তপন বললে, তাতে কী! গান গাইতে গাইতে চলে যাব।

তার মানে এই নয় যে তপন খুব ভালো গাইয়ে। প্রকৃতিদত্ত স্বাভাবিক ক্ষমতায় সে গান গেয়ে থাকে এবং তার এ ক্ষেত্রে একটা আশ্চর্য মৌলিকতা আছে। এক সুরে এক গান সে দুবার গেয়েছে, পরম নিন্দুকও তার সে অপবাদ দিতে পারবে না।

বললুম, থাক—থাক, গানের দরকার নেই। মানুষের আর্টিফিশিয়াল গানে এমন ন্যাচারাল অ্যাট্‌মস্‌ফিয়ারটা মাটি হয়ে যাবে। তার চাইতে জোর পায়ে এগোনো যাক।

তপন একবার সন্দিগ্ধ চোখে আমার দিকে তাকালো। তারপর হাঁটা শুরু করলুম দুজনে।

আধ মাইলটাক যেতেই পায়ে চলা পথের দু ধারে ঘন হয়ে নুয়ে পড়ল শ্যাম লতা আর ঘাসের বন। নীল পাহাড় ছিল বটে, কিন্তু দশ মাইলের এদিকে নয়। বুক সমান জঙ্গল ঠেলে এগোতে এগোতে আমি শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে পড়লুম।

—এই রাস্তা?

—এই রাস্তা।

—কিন্তু এ পথ দিয়ে তো মানুষ যায় মনে হয় না। বাঘ-

ভালুকের মুখে নিয়ে যাচ্ছ নাকি ?

তপন ভ্রূকুটি করে বললে, শহুরে চাল ছাড়ো। গ্রামের রাস্তা এই রকমই হয়ে থাকে। এই শ্যামল বনানী—পাখির ডাক—এই নিবিড় ঘাস—উঃ !

অগত্যা আমিও বলতে যাচ্ছি—'আহা—আঃ'—হঠাৎ দেখি নিদারুণভাবে পা চুলকোতে শুরু করেছে তপন।

—কী হলো ?

—তোমার কাছে তেল-নুন কিছু আছে হে সুকুমার ?

—তেল-নুন! আমি আকাশ থেকে পড়লুম।

—তেল-নুন কোথায় পাব ? আমি কি পকেটে করে রান্নাঘর নিয়ে বেড়াচ্ছি নাকি ?

তপন একটু অপ্রতিভ হলো : না—না, তা নয়—মানে বিছুটি লাগল কি না। বড্ড চুলকোচ্ছে।

বললুম, ওটা যে প্রকৃতির স্নেহের পরশ ভাই। আঘাত সে যে পরশ তব—

—থামো—থামো !—তপন এগিয়ে চলল গোঁজ হয়ে—মাঝে মাঝে নুয়ে পড়ে পা চুলকোতে লাগল। আমিও হুঁশিয়ার হয়ে গেছি—পায়ে চলা পথটায় চোখ রেখে এগোচ্ছি সাবধানে।

—তোমার নিকুঞ্জদা এই জঙ্গলে কী করেন হে ?

তপন বিকৃত মুখে বললে, ব্যবসা !

—এই বনের ভেতরে কিসের ব্যবসা ? কার সঙ্গেই বা ব্যবসা ? বাঘের সঙ্গে নাকি ?—এবার আমার মনে একটা কূট সন্দেহ উঁকি দিতে লাগল : আমরা তাঁর দোকানের মাল হতে যাচ্ছি না তো ?

—ফাজলামি ভালো লাগছে না সুকুমার। ভীষণ জ্বালা করছে পায়ে।

—তোমার নিকুঞ্জদা যদি বাঘের কাছে আমাদের বিক্রি করেন তা হলে যে আরো খারাপ লাগবে।

—আঃ—থামো না!—তপনের গলার আওয়াজেও এবার অস্বস্তি ফুটে বেরুল। মনে হল, সন্দেহটা যে তারও না জেগেছে এমন নয়।

বললুম, ফিরে গেলে কেমন হয়?

—ফিরব কেন? ওই তো দেখা যাচ্ছে।

তাই বটে। খানিক দূরে গোটা কয়েক টিনের চালা চোখে পড়ল। আর টিনের চালা যখন—তখন দোকানে বাঘ ছাড়া অন্য খদ্দেরও থাকতে পারে। বেশ ক্ষিদেও পাচ্ছিল, একটু তাড়াতাড়িই পা চালালুম দুজনে।

বনটা খানিক পরিষ্কার হয়ে এসেছে। সামনেই হাত সাতেক চওড়া একটা পাহাড়ী নালা। নুড়ির ওপর দিয়ে তিরতির করে নীলচে জল চলেছে।

তপন বললে, এ দেশে এগুলোকে জম্পাই বলে।

—জম্পাই? এর ভেতরে ঝম্প দিতে হয় বোধ করি?

—না—না, ঝম্প দিতে হবে কেন? এক হাঁটু জলও হবে না। এই ত্যাখো না—

জুতো হাতে নিয়ে তপন নামল, আমিও নামলুম। তিন চার পা এগিয়েই এক প্রচণ্ড লাফ তপনের।

—উঃ, গেছি-গেছি। বিছুটিতে জল লেগে—

বলেই জলের মধ্যে এক অপরূপ ভৈরব নৃত্য! বেশীক্ষণ নয়, একটু পরেই পিছল নুড়িতে পদস্খলন। শুধু ঝপাত করে নিজেই যে পড়ল তা নয়—পড়বার আগে আমাকেও জাপটে ধরল—নিয়েই পড়ল!

জম্পাই থেকে ঝম্পাই দিয়ে দুজনে যখন উঠে এলুম, তখনকার কথা না বলাই ভালো। তপন খোঁড়াচ্ছে এবং দ্বিগুণ বেগে পা চুলকোচ্ছে। চোট আমারও একটু লেগেছিল, তার চাইতেও নিদারুণ মনোব্যথায় ভাবছিলুম শখের নতুন জুতো জোড়া আমার গেল!

চারদিকে নানারকম অচিন পাখি ডাকছিল তখন। কিন্তু তপনকে বিশেষ উৎসাহিত মনে হলো না।

নিকুঞ্জদা বাংলোয় থাকেন না—থাকেন দুখানি টিনের ঘর নিয়ে। আর ব্যবসাটাও বোঝা গেল এইবারে। সাইনবোর্ডে পরিষ্কার বাংলায় লেখা : লাইসেন্সপ্রাপ্ত গাঁজার দোকান! ভেণ্ডার শ্রীনিকুঞ্জ-বিহারী রায়।

বললুম, এদিককার বাঘেরা বুঝি গাঁজা খায়?

তপন এবার খিঁচিয়ে উঠল : বাঘে গাঁজা খাবে কেন? দূরে দূরে বস্তি দেখছ না? ওরাই কেনে।

—অঃ!

কিন্তু কুক্ষণেই বেরিয়ে পড়া গিয়েছিল। দোকানে নিকুঞ্জদাকে পাওয়া গেল না। একমুখ হেসে তাঁর পুরোনো চাকর রামজী অভ্যর্থনা করল তপনকে।

—খোবোর না দিয়ে কেন আসিয়েসেন? বাবু তো সবেরে গেলো ময়নাগুড়ির হাট, ফিরতে সাঁঝ হোবে।

—সাঁঝ হবে কি রে? বিকেলে আমরা চলে যাব যে! কাল অফিস।

রামজী বললে, হাঁ, সাঁঝ হোবে। তো বৈঠেন। চা-পানি করিয়ে দিই, খানা পাকাই।

নিকুঞ্জদার ঘরের চাবি রামজীর কাছেই ছিল, খুলে বসতে দিলে। নীচু টিনের ঘর, ময়লা ইজিচেয়ার একখানা, একটা ক্যাম্প খাট, লণ্ঠন, গোটা দুই-তিন ট্রাঙ্ক আর স্যুটকেস, খাতাপত্র, পঞ্জিকা, কয়েকটা মাসিক পত্র, এক কোণে লম্বা একটা গাদা বন্দুক। ভিজে জামা কাপড় ছেড়ে—নিকুঞ্জদার দুটো ময়লা লুঙ্গি পরে বসলুম দুজনে।

আমি ইজিচেয়ারে, তপন ক্যাম্প খাটে।

বললুম, পরিবেশটি ভারী মনোরম—কী বলো?

—হুঁ।—তপন হঠাৎ তড়াক করে নেমে পড়ল: ইঃ, পা-টা আবার চুলকে উঠল। যাই—রান্নাঘর থেকে একটু নুন-তেল লাগিয়ে আসি।

তপন বেরিয়ে গেল, আমি পঞ্জিকাটি টেনে নিয়ে অতি বৃহৎ লাল মূলা আর ড্রামহেড বাঁধাকপির (জলদি) সচিত্র বিজ্ঞাপন পড়তে লাগলুম। একটু পরেই রামজী দু কাপ চা আর খান চারেক নেতিয়ে পড়া বিস্কুট এনে হাজির করল।

বললে, আভি খানা পাকিয়ে দিচ্ছি।

পায়ের পরিচর্যা করে তপন ফিরে এল। বললে, কী খাওয়াবি বল তো?

—ডাল হোবে, ভাত হোবে, আলুর চোখা হোবে!

অ্যাঁ! দেড় ঘণ্টা বাস জার্নি করে—দু মাইল জঙ্গল ভেঙে—আছাড় খেয়ে, ভাত-ডাল-আলুর তরকারি!

তপন বললে, দূর! মুরগী রান্না কর।

—মুরগী আভি মিলবে না। বিকালমে লিয়ে আসব।

—বিকেল পর্যন্ত এই ধ্যাধ্যেড়ে জঙ্গলে পড়ে থাকতে বয়ে গেছে!—বিকট মুখে অকৃপণ স্বীকারোক্তি করল তপন: এই তো বন্দুক রয়েছে। বনমুরগী মেরে নিয়ে আয়!

রামজী হাসল: আরে, উ বহুত ঝঞ্ঝাট। তামাম দিনমান ঢুঁড়লে এক আধঠো মিলতে পারে। জঙ্গলমে ঘুমতে হোবে।

তপন প্রায় চিৎকার করে উঠল।

—তুই একটা রাবিশ! চারদিকে এত জঙ্গল—বনমুরগী মিলবে না? আলবৎ মিলবে! চল সুকুমার, চা খেয়েই আমরা বেরোচ্ছি। মুরগী না খেয়ে এখান থেকে ফিরব না।

উৎসাহ দিয়ে বললুম, ঠিক। একেই বলে পৌরুষ!

সেই বিরাট গাদা বন্দুক পুরে নিয়ে শিকারে বেরুনো গেল। গায়ে গেঞ্জি, পরনে ময়লা লুঙ্গি, পায়ে সপসপে ভিজে জুতো—

আদর্শ শিকারীর চেহারা। শ্যামলতা আর ঘাসবন ঠেলে ছোট ছোট বস্তি পাশে রেখে মুরগী শিকারে চলেছি। অচিন পাখির ডাক কানে এল, দু চারটে নেড়ী কুকুর চোখে পড়ল, নালার পাশ থেকে বক উড়ে গেল—কিন্তু কোথায় বনমুরগী! একটা ঘুঘু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না কোথাও।

ঘণ্টাখানেক হাঁটাহাঁটি করে বললুম, ব্রাদার, এবার ফেরো। বেলা বারোটা বাজে—কপালে ডাল আর আলুর চোখাই নাচছে আজ। বনমুরগী আর একবার হবে।

ফস করে তপন একবার পা-টা চুলকে নিলে। তারপর কঠিন মুখে বললে, কভি নেহি। মুরগী মেরে তবে ফিরব।

—বেশ তো, প্রতিজ্ঞা পালন কালকেও করা যেতে পারে। গোটা চারেক টাকা আমায় দিয়ো—বাজার থেকে বড় দেখে একটা কিনে এনে দেব। তারপর নির্মমভাবে তুমি সেটাকে—

—স্টপ!—তপন আমার ঘাড়ে একটা থাবড়া দিলে: লুক!

তাই তো—মুরগীই বটে। মানে, বেশ বড়ো সাইজের মোরগ একটি। জঙ্গলের ধারে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

তপন পাকা শিকারীর মতো হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। চোখ বুজে বন্দুক বাগিয়ে—ওয়ান, টু—থ্রী—গ্রাম্!

সঙ্গে সঙ্গে কাঁধে কুঁদোর গুঁতো খেয়ে তপনও গ্রাম! ভাগ্যিস মাটিতে বসে পড়েছিল—নইলে একটা দুর্ঘটনা ঘটে যেত।

তপনকে টেনে তুললুম।

—এই গাদা বন্দুকগুলো থার্ড ক্লাস! এমন ধাক্কা মারে! একটু হলেই কলার বোন ভেঙে যেত।

—তা হোক—তা হোক। বড় শিকারীরাও কুঁদোর ঘায়ে পড়ে যায়। জিম করবেট্ও উল্টে পড়েছিলেন। ম্যান ইটার্স অফ কুমায়ুন পড়ে দেখো।

—ধুত্তোর কুমায়ুন! মোরগটার কী হল?

আমি বললুম, অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। পড়েছে।

—পড়েছে? লা-লা-লা।—তপন নেচে উঠল, দৌড়ে গিয়ে কুড়িয়ে আনল রক্তাক্ত মোরগটাকে।

—ঈস্, পাক্কা দু সের! খাওয়াটা কেমন হবে বল দিকি?

ব্যাপারটা এইখানে শেষ হলে বেশ মনোরম হতে পারত। কিন্তু উপসংহার আছে।

মোরগ নিয়ে যথাস্থানে পৌঁছুতে না পৌঁছুতে দশ পনেরোটি বস্তির লোক এসে হাজির হলো। প্রচণ্ড চিৎকার তাদের গলায়—এবং কারো কারো হাতে প্রকাণ্ড লাঠি!

বনমোরগ নয়—পোষা মোরগ। অনেক মুরগীর গোষ্ঠীপতি সে—অনেক নাবালক মোরগের সে পিতা এবং বহু অনাগত ডিমের ভাবী স্রষ্টা। এ হেন মোরগকে যে মেরেছে, তার সঙ্গে ওরা একটা বোঝাপড়া করে নিতে চায়।

বোঝাপড়া হলো। কুড়ি টাকা দাবি করেছিল, জোড় হাতে রামজী দশ টাকায় রাজী করাল। আর দশটা টাকা দিতে হলো তপনকেই। অথচ শহরে ওটা টাকা চারেকেই কিনতে পাওয়া যায়।

তবু বনে চরে বেড়ায়—অতএব বনমুরগী। আর এমন প্রাকৃতিক পরিবেশে, নীল পাহাড়ের কোলে, ঝিরিঝিরি ঝরনার গানের মধ্যে যাকে শিকার করা হলো, তার দাম একটু বেশীই তো দিতে হবে।

অন্তত তপনকে সেইটেই আমি বোঝাতে চেয়েছিলুম। বুঝল কিনা জানি না, কিন্তু মোরগের মাংসে ওর এত অরুচি এর আগে আমি কখনো দেখিনি।



বন্ধুকে না রাখিলে

সন্ধ্যেবেলা বাড়ির সামনে গিয়ে যেই ডাক দিয়েছি, অমনি একেবারে লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এল তপন।

—এই যে এসে গেছ তা হলে! যাক।

আমার কেমন ভ্যাবাচ্যাকা লেগে গেল।

এসে তো গেছিই। কিন্তু সেজন্যে অমনভাবে নাচবার কারণটা তো বুঝতে পারছি না। তুমি তো আমায় নেমন্তন্নও করোনি। তা ছাড়া—

তপনের মুখের দিকে তাকিয়ে এবার আমার সন্দেহ হলো: আর মুখে হলদে হলদে ও-সব তুমি মেখেছই বা কী? তোমার গায়ে-হলুদ নাকি হে?

—অ্যাঁ—লেগে গেছে বুঝি?—তপন দু' হাতে মুছতে চেষ্টা করল এবং তার ফলে সেই হলুদ রঙের ব্যাপারটা ঠিক চলে গেল কিনা বুঝতে পারলুম না, কিন্তু যাবার আগে ওকে বেশ করে রাঙিয়ে দিয়ে গেল। মানে বেশ নতুন রকমের একটা চেহারা হলো তপনের।

—ওগুলো কি হে? মুখে মাখছই বা কেন?

—মাখছি কে বললে তোমায়?—তপন বিরক্ত হলো: ধনে বাটা জিরে বাটা—হলুদ বাটা এগুলো কেউ মুখে মাখে?

আমি চমকে গেলুম: মাখছিলে না? তবে খাচ্ছিলে বুঝি? কিন্তু ধনে-জিরে বাটা কি কখনো কেউ খায়? এর পরে তুমি তো দেখছি শিল-নোড়া অবধি খেতে শুরু করে দেবে।

তপন চটে গেল: মিছেমিছি বকে মরছ কেন শুনি? ভেতরে আসবে না রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকবে?

তপনের সচিত্র মুখচ্ছবি দেখে মনে হলো, একটা জটিল রহস্য—একটা গভীর ব্যাপার ঘটতে যাচ্ছে। সুতরাং ভেতরেই পদার্পণ করা গেল।

গরমের ছুটিতে তপনের মা বাবা ভাইবোন সবাই পুরীতে

বেড়াতে চলে গেছেন। ব্যাঙ্কের চাকরিতে তপন আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধা —তার বেরুবার জো নেই। এই ফাঁকে মাঝে মাঝে ওদের বৈঠকখানায় আমি আড্ডা দিই আর তপনের বাবার ইজিচেয়ারে শুয়ে সেই ভদ্রলোকের শখের গড়গড়ায় ভালো বিষ্ণুপুরী তামাক খেয়ে থাকি। আজকেও জুত করে চেয়ারটায় বসতে যাচ্ছি এবং তামাকের জন্যে তপনের চাকর ঝড়ুকে একটা ডাক দেব ভাবছি, ঠিক তখনই মোটা গলায় তপন বললে, উঁহু, ওখানে নয়!

—তবে কোথায়?

—রান্নাঘরে।

আমার সন্দেহ আরো গভীর হলো।

—তার মানে? আমাকেও ধনে বাটা খাওয়াতে চাও নাকি? না ভাই—আমার ওসব অভ্যেস নেই।

—আঃ, এ তো ভারী জ্বালা হলো। কে তোমায় ধনে বাটা খাওয়াতে চায় শুনি?—তপনের মশলামাখা লেবুর আচারের মতো মুখে খানিকটা মোহিনী হাসি মিটমিট করে উঠল: রান্না চাখাব— রান্না! নিজেই রাঁধছি কিনা!

প্রথমটায় প্রাণ উৎসাহে নেচে উঠেছিল, শেষ কথাটায় একটু দমেই গেলুম।

—তুমি রাঁধছ? জানো নাকি রাঁধতে?

—ও আর জানাজানি কি, রাঁধলেই হলো। এসো না—চাখবে একটু। মাংস আর পায়েসটা করে ফেলেছি, এখন মাছের কালিয়া আর ভাতটা হলেই হয়ে যায়। শর্ট বাট্ সার্প কোর্স। এসো— এসো—

রান্নাঘরে এসে দেখি চারদিক একাকার। মেজেটা নানা রঙের জলে জলময়। তার মধ্যে রাশি রাশি পেঁয়াজের খোসা, মাছের আঁশ—আধবাঁটা মশলার কদাকার ধ্বংসাবশেষ। এক ধারে একটা স্টোভের ওপর এলুমিনিয়মের হাঁড়িতে সোঁ সোঁ আওয়াজ হচ্ছে।

—এসব কী ব্যাপার হে? এত সমারোহ করে রাঁধছ কেন? তোমার ঝড়ুটাই বা গেল কোথায়?

—ঝড়ুর কথা আর বোলো না—তপনের মুখে বেদনায় ছায়া পড়ল: প্রত্যেক ছ মাস পরে ওদের চাচা মারা যায়। কোথা থেকে যে এত চাচা পায় ভগবানই জানেন। তাই আজ সকালে দেশে পালিয়েছে। আর আমি—

রান্নাঘরের সেই জলের ওপর তপন একটা মোড়া পেতে বসল—আমাকেও একটা দিলে। আমি সেই মোড়ার দ্বীপে উবু হয়ে বসলুম, তারপরে আবার কৌতূহলী জিজ্ঞাসা নিক্ষেপ করলুম।

চাকর দেশে গেছে বলেই কি এত ঘটা করে মাংস পায়েস রাঁধতে শুরু করেছ? আবার সেইরকম একটা বন-মোরগ শিকার করেছ নাকি? মানে সেই যে বন্দুক দিয়ে কার পোষা মোরগ মেরে কুড়ি টাকা গচ্চা দিয়েছিলে?

—ধুত্তোর তোমার বনমোরগ।—তপন চটে বললে, আমায় কিছু বলতে দেবে সুকুমার? নাকি নিজেই সমানে বকর-বকর করে যাবে?

—আচ্ছা—আচ্ছা—বলো শুনছি।

তপন এক মনে কয়েকটা মাছের টুকরোতে হলুদ-টলুদ কী সব মাখাতে মাখাতে বলে চলল, মানে কলকাতা থেকে আমাদের এক বড়কর্তা গজাননবাবু ইনস্পেক্শনে এসেছেন। ওঁর একটা ভালো রিপোর্ট পেলে আমার প্রমোশন হয়ে যায়। খুব খাইয়ে লোক—মাংস আর পায়েসটা দারুণ ভালোবাসেন। ভাবলুম এই মওকায় নেমন্তন্ন করে খাইয়ে দিই। তাই হাত-টাত কচ্লে বললুম, স্যার, কাল সন্ধ্যেয় আমার ওখানে যদি একবার—! শুনে বললেন, 'তা বেশ, তা বেশ। তবে আমি বেশি জিনিস পছন্দ করিনে, মানে—

শর্ট আর শার্প কোর্স হলেই চলে। একটু মাংস-পায়েস—আর মাছের ঝোল-ভাত, ব্যস!' আমি তো নেমন্তন্ন করে এলুম—ইদিকে ঝড়্ হতচ্ছাড়া দিন বুঝে হাওয়া হয়ে গেল। আর নেমন্তন্নও তো ফিরিয়ে নিতে পারি না—তাই—

আমি মেঝেতে একটু শুকনো জায়গা দেখে পা নামাতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু খানিকটা মাছ ধোয়া জল সেদিকে তেড়ে আসছে দেখে চট করে আবার মোড়াতেই উবু হয়ে বসলুম। বেশ ব্যালান্স্ করে বসতে হচ্ছিল, কারণ উল্টে পড়লে আমাকেই মৎস্যাবতার হয়ে মেঝের সেই নানা রঙের ঝোলে সাঁতার দিতে হবে!

বললুম, পায়েস আর মাংসটা তো হয়েই গেছে বলছ—কিন্তু—আমার নাকটা হঠাৎ চোখা হয়ে উঠল; কিন্তু হাঁড়িতে একটা কিছু পোড়াচ্ছ বলে বোধ হচ্ছে। ওটাও কি কোনো খাস্তদ্রব্য নাকি?

—অ্যাঁ—পোড়াচ্ছি মানে? ভাত হচ্ছে যে—তপন পা পিছলে সড়াক্ করে পড়তে পড়তে হাঁড়ির দিকে এগোল, তারপর হুম্ করে টেনে নামালো।

—ইস্—ইস্ আঙুলে ফোশ্কা পড়ে গেল যে! ওফ! ওয়াঃ!

আমি বললুম, বার্নল-ফার্নল থাকে তো—

—চুলোয় যাক বার্নল—তপন একটা খুন্তি দিয়ে ঠনাৎ করে হাঁড়ির ঢাকনাটা নীচে ফেলে দিলে। আর তার ভেতর থেকে ঘন ধোঁয়ার সঙ্গে পাকিয়ে উঠতে লাগল পোড়া ভাতের গন্ধ।

—এঃ, ভাতটা একেবারে লাল হয়ে গেছে—তপন হাহাকার করে উঠল: ভালো গোবিন্দভোগ চাল এনেছিলুম—তার বারোটা বেজে গেল। ইঃ ইঃ—এখন খেতে দিই কি গজাননবাবুকে?

আমি জিরাফের মতো গলা বাড়িয়ে একবার ভাতটা পর্যবেক্ষণ করলুম। মাথায় বুদ্ধি এসে গেল একটা।

—দিব্যি লালটুকটুকে দেখাচ্ছে। ওটাকে পোলাও বানালে হয় না?

—পোলাও!—তপন বিচলিত হল: তা কী করে হয়? পোড়া ভাত কি কখনো পোলাও হতে পারে?

—কেন পারে না?—আমি ওকে উৎসাহ দিতে লাগলুম: রঙটা তো হয়েই রয়েছে—এখন বেশ করে খানিকটা ঘি ঢেলে দাও। লাল ভাতে ঘি মাখানো থাকলে তাকেই তো পোলাও বলে!

তপন ফোস্‌কাপড়া দুটো আঙুল একবার মাথার চুলে ঘষে নিলে। তারপর চিন্তিত হয়ে বললে, ঠিক তাকেই বলে কি? মানে—পেস্তা-বাদাম-কিস্‌মিস্—

—তাও দিয়ে দাও না গোটাকয়েক।

—পাব কোথায় শুনি?—তপন ব্যাজার হয়ে উঠল: আজ রোববার—বাজার বন্ধ না? তবে—তপন একটু উৎসাহিত হয়ে উঠল: আচ্ছা, আঙুর শুকিয়েই তো কিসমিস্ হয়—না হে?

আমি ও ব্যাপারে খুব নিশ্চিন্ত নই। তবু বললুম, সেইরকমই তো শুনেছি।

—আজ বিকেলে সস্তায় এক পো আঙুর কিনেছিলুম। একটু টক আছে—তা—ওরই গোটাকয়েক দিয়ে দিই কী বলো?

—দাও—দাও। ঘিয়ে ভাজা হলেই আঙুর কিস্‌মিস্ হয়ে যাবে। টক হলে বোধ হয় বিশেষ ক্ষতি হবে না—কোনো কোনো কিস্‌মিস্ তো একটু টক হয়েই থাকে।

—তা তো হয়ই।—তপন আমার সঙ্গে একমত হল, তারপর বেশ খুশি হয়ে বললে, বুদ্ধিটা কিন্তু ভালোই দিয়েছ সুকুমার। এই জন্যেই তো সময়-অসময়ে বন্ধুর দরকার হয়।

তপন উঠে গিয়ে কোথা থেকে এক থাবা আঙুর নিয়ে এল। তারপর সেরখানেক ঘি আর সেই আঙুরগুলো ভাতের মধ্যে ঢেলে একটা খুন্তি দিয়ে ঘটর ঘটর করে নাড়তে লাগল। আমি মুগ্ধ

দৃষ্টিতে ওর সেই কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করতে লাগলুম। খানিকটা নাড়ানাড়ি করে তপন নাকটা কুঁচকে বললে, গন্ধটা কী বলে ইয়ে—তেমন ভালো বোধ হচ্ছে না কিন্তু!

আমি বললুম, গন্ধে কী আসে যায় হে! স্বাদেই মেরে দেবে।

—তা মেরে দেবে বটে। কিন্তু খানিকটা ভাত—মানে পোলাও—হাঁড়ির তলায় শক্ত হয়ে আটকে আছে যে! উঠছে না!

বললুম, উঠিয়ো না—থাকুক। হাঁড়িখানেক তো হয়েছে দেখছি। ওপরে যা আছে তাই তো চারজনে খেয়েও শেষ করতে পারবে না।

—হুঁ, চালটা একটু বেশি পড়ে গেছে বোধ হচ্ছে—তপন মাথা নাড়ল: তাইতেই পুড়ে গেল খুব সম্ভব। যাক, তবু এই সুযোগে পোলাও রান্নাটাও শিখে ফেলা গেল—কী বলো?

—নির্ঘাত। জীবনে সুযোগ তো এইভাবেই আসে—এম্‌নি অ্যাক্‌সিডেণ্ট থেকেই বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়। কিন্তু—একটা অত্যন্ত জরুরী কথা আমার মনে পড়ে গেল: আমাকে যে মাংস, আর পায়েস চাখাবে বলেছিলে—তার কী হলো?

পোলাও রান্নাটা শিখে ফেলায় তপনকে বেশ পুলকিত দেখা গেল। এক গাল লেবুর আচার বিনিন্দিত হাসি হেসে বললে, হচ্ছে হচ্ছে। চাখাবো বই কি। আর পোলাওটার পরিমাণ যা দেখছি তাতে খাইয়েও দিতে পারব বোধ হয়। কিন্তু একটু দাঁড়াও—মাছের ঝোলটাকে চাপিয়ে দিই আগে। তা হলেই আমার খেলা খতম—একদম ছুটি! দেখছ না, তখন থেকে খামোকা স্টোভটা পুড়ে যাচ্ছে?

তখন একটা কড়াই এনে স্টোভে বসিয়ে দিলে। প্রাণ খুলে তেল ঢালল তাতে। ঠিক কতটা ঢালল বলতে পারব না—আধ সেরের কাছাকাছি বলে মনে হলো।

তারপর মাছ দিতে গিয়েই থেমে গেল—এই যাঃ, ঠিক মনে

পড়েছে। ওঃ, একটু হলেই ভুলে গিয়েছিলুম।—বলেই টপ করে পাশের কুলুঙ্গি থেকে কী একটা টেনে এনে মুখে পরে নিলে। আর আমি আঁতকে উঠে, মোড়া থেকে উল্‌টে পড়তে পড়তে সামলে গেলুম।

—একি কাণ্ড—অ্যাঁ।

কাগজের লম্বা নাক, বড় বড় দাঁত আর মোটা গোঁফওলা এক ভয়াবহ মুখোশ। তার ভেতর থেকে হ্যা-হ্যা-হ্যা করে একটা বিকট হাসি ছাড়ল তপন।

—হঠাৎ ও-রকম মুখোশ পরে লোককে চমকে দেবার মানে কী—শুনি ?—আমার রাগ হয়ে গেল।

—হ্যা-হ্যা-হ্যা—এবার তপনের মুখোশখোলা আচারমার্কা হাসি : আমার ব্রেনওয়েভ। মাছ কিনে আনছি, দেখি রাস্তার ধারে বিক্রি করছে এগুলো। মনে পড়ল, মা কড়াইতে মাছ দিলেই দেখেছি তেলফেল ছিট্‌কে ফিট্‌কে মুখে আসে। তাই এটাকে মাস্ক করে —মানে তেল-মাস্ক করে মাছ ভাজব। দেখে নাও—

বলে আবার সেই বিকট মুখোশটা পরে নিলে, আর সমস্ত মাছগুলো ঢেলে দিলে তেলের ভেতরে। তারপর তক্ষুনি সেই খুন্তিটা নিয়ে ঘটর ঘটর করে মাছ নাড়তে লাগল।

আমি বললুম, আহা-হা—আস্তে নাড়ো, মাছ ভেঙে যাবে যে—

তপন মুখোশ-পরা ভয়ঙ্কর পাকানো চোখে আমার দিকে তাকালো। গোঁ গোঁ করে বললে, গেছেই। মানে তেলে পড়তেই কেমন লাড্ডুর মতো পাকিয়ে গেল।

—তা হলে ?

মুখোশ খুলে তপন বললে ঝোল হবে না বোধ হচ্ছে। এগুলো দিয়ে এখন কী করা যায় বলো তো ? চপ করে দেখব ?

—সেও তো ভাবতে হবে।—আমি বললুম আর ভাজাটাই

সবচেয়ে বিপজ্জনক। ওটা টক করা যায় না? মানে—মাছের চাটনি? ধরো খানিকটা তেঁতুল গুলে দিলে—ভালোই হবে বোধ হয়?

—না, মাছের চাট্‌নির দরকার নেই।—তপন এবার একটু গম্ভীর: তেঁতুল আমি একেবারে পছন্দ করি না। ওটাকে ফ্রাই বলে যদি চালাই—কেমন হয়?

—কিন্তু ফ্রাই কি ঠিক ওইরকম হয়ে থাকে? মানে, সেটা কি খানিকটা কাটলেটের মতো নয়?—আমার একটু সন্দেহ হলো।

তপন বললে, তা বটে। কিন্তু যদি বলি এটা মেক্সিকো ফ্রাই? মানে গজাননবাবু নিশ্চয়ই কখনো মেক্সিকোতে যাননি।

আমি বললুম, স্পুটনিক ফ্রাই বললে আরো চমকে দেওয়া যায়।

তপন আপত্তি করল: না—চমকে দিতে চাই না, চাকরিতে প্রমোশন পেতে চাই। ওটাকে বরং মেক্সিকো ফ্রাই-ই বলি।

—বলো। 'গোলাপ যে নামে ডাকো, সুগন্ধ বিতরে।' গজাননকে কায়দা করতে পারলেই হলো। কিন্তু—আবার সেই জরুরী প্রশ্নটা আমার মনে পড়ে গেল: কিন্তু তোমার সেই দুটো অ্যাচিভমেন্ট—সেই পায়েস আর মাংস যে আমাকে চাখাবে বলেছিলে, তার কী হলো?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ—হচ্ছে।—মেক্সিকো ফ্রাইকে আরো খানিকটা ঘট ঘট শব্দে নাড়ানাড়ি করে তপন স্টোভ নেবালো। বলতে লাগল, মাছের ঝোল করা গেল না বটে, কিন্তু পোলাওটা তো বাড়তি হলো। আর কী বলে—তা ফ্রাইটাও বেশ নতুন ধরনের দাঁড়িয়েছে। ভালো কথা, পোলাওতে তো কোনো মশলা দেওয়া হলো না। একটুখানি ধনে বাঁটা আছে, দিয়ে দিই?

—দাও দাও—আমি তক্ষুণি সমর্থন করলুম: পোলাওকে ধনী—

মানে রিচ করাই তো দস্তুর।

বেশি বলতে হলো না। তৎক্ষণাৎ তপন ওটাকে রিচ করে ফেলল।

—এইবার চাখো—একটা রাইস প্লেট নিয়ে তপন আমার জন্যে সব সাজাতে আরম্ভ করলে।

আমি একটু অস্বস্তি বোধ করলুম: বলছিলুম কি ফ্রাই থাক। ওটা বরং না-ই চাখলুম। আর পোলাওটাও—

—বাঃ, সে কি হয়?—তপন ব্যথিত হলো: তোমার আইডিয়া-তেই পোলাও করলুম—একটু না চাখলে চলে? নাও, ধরো ধরো। এই যে—চামচে দিচ্ছি—

কী আর করা—নিতেই হলো আমাকে। যেই একটু পোলাও জিভে ঠেকিয়েছি—সঙ্গে সঙ্গে তার উৎকট স্বাদে গন্ধে নাকমুখ যেন বুজে উঠতে চাইল। প্রাণ বাঁচাবার জন্যে গাঢ় লাল রঙের ঝোল থেকে একটা মাংসের টুকরোকে তুলতে গেছি—সেটা চামচের চাপে সোজা বুলেটের মতো প্লেট থেকে ছিটকে বেরুল। হাজার খণ্ডে বিভক্ত এবং ঝোলায়িত হয়েও সে আদিম ও অদমিত—একেবারে পাঁঠার গোঁ নিয়ে ছুটে গেল—ব্যা করে ডেকেও গেল কিনা কে জানে। এই সহস্র-খণ্ডিত অথচ বহুরূপে জীবন্ত পাঁঠাকে কিছুতেই কায়দা করা যাবে না জেনে আমি একটুখানি ঝোল মুখে তুলে নিলুম।

আর তখুনি চীৎকার ছাড়তে হলো। তারস্বরে নয়—একেবারে কাছি স্বরে।

—আগুন—আগুন! মুখ জ্বলে গেল—আগুন—

ধাবন্ত পাঁঠা দেখেও তপন বিচলিত হয়নি, এবার ঘাবড়েই গেল একটুখানি।

—ঝাল হয়ে গেছে বুঝি? আমি ভাবলুম পঞ্চাননবাবু চিটাগাঙের লোক—তাই একটু বেশি করে লঙ্কাবাটা—

—রেখে দাও চিটাগাঙ। এই ঝোল খেলে গজানন একেবারে গাঙসই হয়ে যাবে। উঃ—আগুন—দাবানল—বাড়ব বহ্নি—ফায়ার ব্রিগেড—না-না—পায়েস—পায়েস—

—হাঁ-হাঁ-হাঁ—দিচ্ছি—

বিদ্যুৎবেগে একটা বাটিতে করে প্রায় তরল শাদারঙের কী খানিকটা দিলে আমায়। এবং তাতে একটি—মাত্র একটি চুমুক দেবার পরেই—

তড়াক করে আমি বাইরে বেরিয়ে পড়লুম—একেবারে নালাটার ধারে। পেটের বত্রিশ নাড়ী এক সঙ্গে 'চণ্ডালিকা'র কোরাস গাইতে লাগল: "পাক দে—পাক দে—পাক দে-এ-এ!" এবং গলা দিয়ে অন্নপ্রাশনের নয়, তারও আগের—মানে পূর্বজন্মের একআধ দানাও কিছু যদি থাকে, সব 'হা-রে-রে-রে' করে বেরিয়ে আসতে লাগল!

আর তপন চাঁদি চুলকোতে চুলকোতে বলে চলল: ই-হি-হি, আমারই ভুল হয়ে গেছে। মাছটাছ কুটে সাবান দিয়ে হাতটা কখন পায়েসের গামলাতেই ধুয়ে-ফেলেছি, টেরও পাইনি!

আমি যখন খানিকটা সামলে নিয়েছি, তখন তপন বসে পড়েছে মাথায় হাত দিয়ে। ওর লেবুর আচার মার্কা মুখটা লঙ্কার আচারের মতো শীর্ণ এবং করুণ।

একবার বিড়বিড় করে বললে, পোলাওটাও অন্তত খাওয়ানো যাবে না একটুখানি?

আমি জবাব দিলুম: ক্ষেপে গিয়ে তোমায় কামড়ে দিতে পারেন গজানন।

—আর মাংসটা?

—শিং তুলে ওঁকে গুঁতিয়ে দেবে।

—তা হলে পায়েস? না-না—ওতে আবার মাছ কেটে, সাবান দিয়ে হাত ধুয়েছি—ও চলবে না। কিন্তু একটুখানি ফ্রাই?

ট্রাই করলেই মারা যাবেন। এবং তাতে খুব সম্ভব তোমার ফাঁসি হবে।

তপন এবার ডুকরে উঠল।

—কী হবে ভাই? প্রমোশন তো গেলই, কিন্তু লোকটা যে স্টেশনের কাছের ডাকবাংলো থেকে পুরো এক মাইল হেঁটে খেতে আসবে—তার কী করি? আর ন'টা প্রায় বাজে—আসতেও তো দেরি নেই।

অগত্যা নিজেকে বললুম, উত্তিষ্ঠত: জাগ্রত:। যেমন পায়েসই খাওয়াক—বন্ধু তো! এবং দুঃসময়ে বন্ধুকে বন্ধু না রাখিলে কে রাখিবে!

বললুম, তোমায় কিছু ভাবতে হবে না—চুপচাপ বসে থাকো। নিজের রান্নাও খেতে পারো এক আধটুখানি। আমি তোমার গজাননকে দেখছি। কেবল তোমার রান্নাঘর থেকে একটা দরকারী জিনিস আমায় নিতে হবে।

তপনের বাড়ির সামনে একটা ছোট কম্পাউণ্ড, গেটের দু' ধারে গোটাচারেক বড় বড় আমগাছ। রাস্তার ইলেক্‌ট্রিক একটু দূরে —বেশ আলো-আঁধারি তৈরী হয়েছে খানিকটা।

আমাকে মিনিট সাতেকের বেশি দেরি করতে হলো না। বেশ হৃষ্ট গলায় গান শোনা যাচ্ছে: 'বঁধুয়া, নিদ্ নাহি আঁখিপাতে।' অর্থাৎ গজাননবাবু আসছেন। নিদ তাঁর থাকবার কথা নয়—অচিরে একটি শর্ট আর শার্প কোর্সের সম্ভাবনা রয়েছে যখন! আমিও তৈরী হয়ে নিলুম।

প্রথমে আমগাছের আড়াল থেকে বললুম: গাঁ-গাঁ-গাঁ—

গজানন চমকে থেমে বললেন, কে—কে ওখানে?

এবারে সামনে বেরুতে হলো। সেই মুখোশটাকে—মানে

তপনের সেই অয়েলমাস্ককে—ইলেকট্রিকের আলো-আঁধারিতে বিকশিত ক'রে হাসলুম তপনের মতো ঃ হাঃ-হ্যাঃ-হ্যাঃ—এবং ভারতীয় নাচের ছন্দে খানিকটা অগ্রসর হলুম গজাননের দিকে।

গজানন আকাশের দিকে একটা লাফ মারলেন, কেবল বললেন, ওরে ঃ—!. তারপরে যে গতিতে—যে রকম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তিনি ছুটলেন, তাতে পরিষ্কার বোঝা গেল ঃ এক মাইল দূরের ডাকবাংলো কেন, তিনশো মাইল দূরে কলকাতা পর্যন্ত না পৌছে তিনি আর থামছেন না!

'বন্ধুকে বন্ধু না রাখিলে কে রাখিবে ?' আপনারাই বলুন।



মাৎস্যন্যায়

তপন, বললে, চলো, খামারে যাওয়া যাক।

—খামারে? কেন?—আমি ভয়ানক চমকে গেলুমঃ আমি গোরু না ছাগল যে খামারে যাব? তোমার ইচ্ছে হয় তুমি যাও—যত খুশী খড় আর কাঁচা ঘাস চিবুতে থাকো।

তপন বিরক্ত হয়ে বললে, তুমি একটি ব-ব—বোগাস! এই জন্যেই তো তোমার রাবিশ গল্পগুলো পত্রিকায় পাঠালেই ফেরত দেয়! খামারে কি কেবল গোরু-ছাগল থাকে নাকি? ধান থাকে।

—তবে কি আমাকে ধান খেতে যেতে বলছ? না ভাই—আমি ধান খেতে ভালো বাসি না।

—আলিয়োনা বলছি সুকুমার। ধান খেতে কে বলেছে তোমায়? ওখানে আমাদের পুকুর আছে—মাছ মারব।

শুনে আমার ছু কান খাড়া হলো। আজ মাসখানেক হলো বাজার থেকে মাছ উধাও। শাকপাতা চিবুতে চিবুতে মনে হয় কোন্‌দিন হঠাৎ ব্যা করে ডেকে উঠব।

বললুম, মাছ! প্রাগৈতিহাসিক যুগে ওই নামে একটা প্রানী ছিল বলে শুনেছি। তাদের গায়ে নাকি আঁশ ছিল, আর আঁশটে গন্ধ ছিল, আঁশ বটি নামে একরকম অস্ত্র দিয়ে নাকি তাদের কাটা হতো, তাদের দিয়ে নাকি ঝাল-ঝোল নামে নানারকম সুখাদ্য তৈরি করা যেত। সে প্রাণী কি আর আছে ভাই? তারা তো কবে সেই ডোডো পাখির মতো লুপ্ত হয়ে গেছে।

তপন এক গাল হেসে বললে, না ভাই, অত মুষড়ে যেয়ো না। এখনো তারা সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়নি—আমাদের খামারের পুকুরে দুচারটে আছে। যদি দেখতে এবং খেতে চাও, তা হলে আমার সঙ্গে—

লাফিয়ে উঠে বললুম, এক্ষুনি?

তপন বললে, এক্ষুনি।

এই পর্যন্ত হল উৎসাহ-পর্ব। তারপরে আমাকে আর ঠেকানো গেল না। তৎক্ষণাৎ যেন আমি জাতিস্মর হয়ে উঠলুম, আমার চোখের সামনে ঝাল-ঝোল-কালিয়ার রূপ ধরে এক স্বর্গীয় শোভা-যাত্রা শুরু হয়ে গেল এবং আমি তপনের সঙ্গে—যাকে বলে 'ইরম্মদ বেগে', খামারের দিকে রওনা হলুম।

তপনের খামার দূরে নয়—শহর থেকে মাইল তিনেকের মধ্যেই। চারধারে ধানক্ষেত, মাঝখানে আম-কাঁটাল-কলা-সুপুরির গাছ, একটা ছোট টিনের বাড়ি আর বাঁধানো ঘাটলার একটি পুকুর। পুকুরের এক ধারে দুটো ধানের গোলা।

আমরা সাইকেল থেকে নামতেই একদল মুরগীর ছানা চিঁ চিঁ করে ছুটে পালালো, দড়ি বাঁধা একটা পাটকিলে রঙের রামছাগল মিহি গলায় ডেকে অভ্যর্থনা করল আর কোদাল কাঁধে মাল-কোঁচা মারা একটি বেঁটে কালো লোক আমাদের দিকে এক গাল হেসে এগিয়ে এল।

—পেন্নাম হই ছোটবাবু।

তপন বললে, তা হও, আপত্তি নেই। আমি যে খবর পাঠিয়েছিলুম—পেয়েছিলে তো ?

লোকটি বললে, এজ্ঞে।

—ছিপ, চার—সব রেডি আছে তো ?

—এজ্ঞে।

—চার ফেলে রেখেছ ?

—এজ্ঞে তাও রেখেছি।—লোকটি আবার বিনীত হাসি হাসল কিন্তুক্—

—কিন্তুক ?—তপন ভুরু কোঁচকালো : কিন্তুক্ মানে কী ?

—এজ্ঞে বলছিলুম কি, মাছ ধরবেন সে তো ভালো কথা —কিন্তুক এ সময়টা মাছে খায় না।

—মাছে খায় না ? তপন চটে গেল : তবে কি উপোস করে

থাকে? তোমার মতলব তো ভালো বলে মনে হচ্ছে না রাধেশ্যাম। এই তো সেদিনও পঞ্চাশ টাকার পোনা ছাড়া হয়েছে। তুমিই সেগুলো সাবাড় করোনি তো?

রাধেশ্যাম এক হাত লম্বা জিভ কাটল।

—এজ্ঞে আমি কি বোয়াল মাছ যে পোনা ধরে খাব? কী যে বলেন!

—বোয়াল না রাঘব বোয়াল সে তুমিই জানো। মোদ্দা কথা, মাছ আমরা আজ ধরবই। তুমি ছিপ আর টোপ নিয়ে এসো, আমরা ঘাটে যাচ্ছি।

মাঝারি সাইজের দিব্যি পুকুরটি। নীল জল টলটল করছে। সুপুরি গাছের ছায়া কাঁপছে জলের ওপর। দুজনে ঘাটে গিয়ে বসা গেল।

তপন বেশ ভালুকের মতো তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। বললে, বেশ জায়গাটা—কী বলো? চারদিকে কী মনোরম শ্যামলের শোভা—আহা!

অগত্যা আমাকেও বলতে হল: আহা!—তারপর একটু মাথা চুলকে বললুম, কিন্তু ব্যাপারটা কী জানো ভাই, একমাস ধরে খালি শ্যামল—মানে শাক-সব্জী চেখে চেখে—ইয়ে শ্যামলের ওপর অরুচি ধরে গেছে। মানে এক আধটা মাছ-টাছ হলে—

—হবে, হবে, মাছও হবে। ঘাবড়াচ্ছ কেন?

—ঘাবড়াতে চাইনি ভাই, কিন্তু তোমার রাধেশ্যাম যে বলছিল এ সময় নাকি মাছে খায় না?

—মাছে খায় না মানে? মাছের বাবা খাবে।—তপনকে উত্তেজিত দেখা গেল।

—মাছের বাবা?—শুনে কান দুটো ভারী খুশী হলো: মাছের বাবা খেলেই তো ভালো হয়—বেশ সের পাঁচেক একটা পাওয়া যাবে—কী বলো? কিংবা মাছের ঠাকুর্দা? সে তো আরো ভালো

—সের দশেক হবেই, তাই না ?

তপন চিন্তিত হলো।

—তা হতে পারে। দশ-পনেরো সের হওয়াই তো উচিত।

—তা হলে ভাই ওই ঠাকুর্দাকেই ধরো। বুড়ো হয়ে বেশিদিন বেঁচে থেকেই বা ওর লাভ কী ? ওর কি এখন মারা যাওয়াই উচিত নয় ? এ সম্বন্ধে তোমার কী ধারণা ?

তপনের ধারণাটা জানা গেল না। তার আগেই রাধেশ্যাম দুটো ছিপ আর টোপ নিয়ে এল। তপন বললে, এখন চট করে চা করে আনো দেখি রাধেশ্যাম। জুত করে লেগে যাওয়া যাক।

উৎসাহ দিয়ে বললুম, হাঁ, লেগে যাও। কিন্তু ভাই, ওই ঠাকুর্দাকে ছেড়ো না। ওকে ধরাই চাই।

—দেখা যাক।—তপন গম্ভীর হয়ে টোপ গাঁথতে লাগল। তারপর আমাকে জিজ্ঞেস করলে, কিহে, তোমার মাছ ধরা-টরা আসে ?

—ছেলেবেলায় পুঁটি মাছ ধরতুম।—আমাকে স্বীকারোক্তি করতে হলো।

—পুঁটি মাছ—হেঃ। বোঝা গেছে তোমার দৌড়—তপন অনুকম্পার হাসি হেসে ছপাৎ ছপাৎ করে বঁড়শি ফেলল জলের ভেতর। গম্ভীর হয়ে বললে, চুপ করে বসে থাকো এখন—বুঝেছ তো ? বকবক করলে মাছ চারে আসবে না।

—ঠিক আছে। মাছ খাওয়ার সময়েই ভালো করে মুখটা খোলা যাবে না হয়। তুমি ওই ঠাকুর্দাটাকে কপাৎ করে পাকড়ে ফেলো ভাই, দেরী করো না।

তপন বললে, সে হবে। তুমি চুপ করে থাকো।

চুপ করেই আছি। নিরুপায় হয়ে চারদিকের শ্যামলিমাই দেখতে হচ্ছে আমাকে। তপন বকের মতো ফাতনার দিকে তাকিয়ে। মাথার ওপর কাক উড়ছে, বাতাস বইছে, জল কাঁপছে। ঢেউয়ে ঢেউয়ে ফাতনা দুলছে, কিন্তু কাছাকাছি মাছের কোনো চিহ্ন আছে বলে মনে হলো না।

—কই হে, খাচ্ছে না তো?—আমি থাকতে পারলুম না।

—একি তোমার পুঁটিমাছ পেয়েছ যে ফেললে আর টুপ করে গিলল?—তপন বিরক্ত হলো: ধৈর্য ধরতে হয়।

—আচ্ছা ধরছি।

রাধেশ্যাম চা দিয়ে গেল। তাই খেতে লাগলুম বসে বসে।

তপনও চায়ে চুমুক দিচ্ছিল। ঠিক তখুনি আমার চোখে পড়ল। ফাতনা বেশ সন্দেহজনকভাবে নড়ছে যেন। টিপ-টিপ—টিপ—

—খাচ্ছে—খাচ্ছে—বলে যেই চেঁচিয়ে উঠেছি, সঙ্গে সঙ্গে বিষম চমকে গিয়ে আধ পেয়ালা গরম চা নিজের পায়ের ওপর ঢেলে ফেলল তপন। তারপর হেঁইয়ো করে ছিপে এক পেল্লায় টান!

শাঁই করে ছিপ আকাশে উঠল। কিন্তু বঁড়শি ফাঁকা। মাছ নেই—মাছের আঁশ পর্যন্ত নেই।

দারুণ চটে কটমট করে আমার দিকে তাকালো তপন।

—অমন হাউমাউ করে চ্যাঁচালে যে?

—ফাতনা নড়ছিল, তাই ওয়ার্নিং দিচ্ছিলুম তোমাকে।

—অমন ডাকাতে পড়া হাঁক ছাড়বে তাই বলে? তোমার চিৎকারেই মাছ পালিয়েছে। মাঝখান থেকে আমার পা-টা শুদ্ধু পুড়িয়ে দিলে!

—এক মাস মাছ খাইনি ভাই। নার্ভাস টেনশনটা সামলাতে পারিনি।

—কিন্তু সামলাতে হবে। না সামলালে আজও মাছ খাওয়া

জুটবে না তা বলে দিচ্ছি!—তপন আবার ব্যাজার মুখে টোপ গেঁথে বড়শি ফেলল : একদম স্পীকটি নট্—বুঝেছ?

—বুঝেছি, বুঝেছি।

আবার চুপ করে বসে আছি। তপনের মুখ অসাধারণ গম্ভীর—সেদিকে তাকিয়ে কথা বলতে আর ভরসা হচ্ছে না। এদিকের একটা সুপুরি গাছে কাকে বাসা বাঁধছে, তাই দেখছি এক মনে।

শাঁই—সপাং—

আবার ছিপের আওয়াজে ফিরে তাকালুম। আর একটা পেল্লায় টান মেরেছে তপন। কিন্তু এবারেও বঁড়শি ফাঁকা!

—মাছ কোথায় হে?

তপন গোঁ গোঁ করে বললে, চুলোয়। ওঠেনি—দেখতেই পাচ্ছ।

—এবার তো ভাই আমি চ্যাঁচাই নি। উঠল না কেন তা হলে?

—সব টানেই মাছ ওঠে নাকি? বিরক্ত কোরো না—চুপ করে থাকো।

সব টানে কেন—কোনো টানেই যে ওঠে না—ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সেটা বিলক্ষণ বোঝা গেল। বার ত্রিশেক ছিপ আকাশে উঠল, কিন্তু মাছের ঠাকুর্দা কেন—তার নাতির ল্যাজের ডগাটুকু পর্যন্ত চোখে পড়ল না।

রাধেশ্যাম কখন এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে। হেসে বললে, এজ্ঞে মাছ খাচ্ছে নি কুচো চিংড়িতে ঠুকরে খাচ্ছে।

মুখ ফিরিয়ে বিকট একটা গর্জন করল তপন।

—তোমাকে আর ওস্তাদি করতে হবে না। মাছের ঠোকর আমি চিনি না—না?

রাধেশ্যাম কুঁকড়ে গেল : এজ্ঞে চেনেন বই কি, আপনি না

চিনলে কে চিনবে। কিন্তুক—

—আবার কিন্তুক্। গেট-আউট—

সুড়সুড় করে সরে পড়ল রাধেশ্যাম।

তপন গজগজ করতে লাগল: মাছে খাচ্ছে না—শেখাতে এসেছে আমাকে। মামা বাড়িতে গিয়ে ছোটমামাকে কত মাছ ধরতে দেখেছি আমি—ও ব্যাটা ছোটমামার চাইতেও বেশি জানে নাকি?

এইবার আমার সন্দেহ হলো।

তার মানে? ছোটমামার মাছ ধরাই বুঝি দেখেছ কেবল? নিজের হাতে ধরো নি নাকি কখনো? সবটাই থিয়োরিটিক্যাল নাকি?

—থিয়োরিটিক্যাল তো কী হয়েছে! থিয়োরী থেকেই প্র্যাক্‌টিস্।

—অ।

তৎক্ষণাৎ আমি দমে গেলুম—'ধুক করে নিবে গেল বুকভরা আশা।' তপনের সেই থিয়োরিটিক্যাল্ মাংস-পোলাও রান্না আমি এখনো ভুলি নি। সে রান্নার স্বাদ অবিস্মরণীয়। সারা জীবনেও তা ভোলবার জো নেই। ছোট্ট মামার রহস্য জানা থাকলে কে এই খামারে আসত!

আবার শাঁই করে ছিপের আওয়াজ এবং তপনের জয়ধ্বনি: গেঁথেছি।

গেঁথেছ! আমি তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম: সেই ঠাকুর্দাই তো? শক্ত করে পাকড়াও ভাই—ছেড়ো না!

—ছাড়ছে কে? ছাড়াছাড়ির কারবার আছে নাকি আর?—তপন দাঁড়িয়ে পড়ল: জলের তলায় বসে গেছে মাছটা, উঠতে চাইছে না! আচ্ছা, আমিও তপন চৌধুরী—দেখে নিচ্ছি তোমায়।

—হেঁইয়ো!

আর একটা আসুরিক টান। এবং তারপর ঃ

জলের তলা থেকে বিরাট একটি কালো বস্তু ডাঙায় ছিটকে চলে এল। ঠকাস্ করে একটা বক্সিং গ্লাভের মতো সেটা আমার কপালে পড়ল এবং তৎক্ষণাৎ আমাকে নক্আউট করে দিলে।

—উল্টে পড়েই আমি লাফিয়ে উঠলুম তক্ষুনি।

—কী মাছ হে, অমন কালো কুচকুচে? মোক্ষম একটা গুঁতো মেরেছে আমায়। কালবোস?

—না, কালবোস নয়।

—তবে কি কাতলা? কাতলাই কি আমাকে কাত করল?

—না, কাত্লাও নয়।—তপনের মুখ শোকাচ্ছন্ন ঃ এক পাটি ছেঁড়া জুতো।

—অ্যাঁ!

আমি বাতাহত কদলী-বৃক্ষের মতো আবার ধপাস্ করে বসে পড়লুম। জুতোই বটে···স্যাওলা আর কাদায় জড়ানো কার এক পাটি বিরাট জুতো—জলের তলায় বাস করতে করতে এখন তার পাক্কা তিন সের ওজন। কার পদহীন জুতো এই বেলা দশটার সময় খামোকা আমাকে এমন করে জুতিয়ে গেল কে জানে!

তপন ঘোঁতঘোঁত করে বলল, বঁড়শিটাও ভেঙে গেছে হে! কোন্ রাস্কেল যে—

বলতে না বলতেই এক অঘটন! সেই বিচ্ছিরি বিকট জুতোটার ভেতর থেকে একটি আওয়াজ উঠল ছটাং এবং পরক্ষণেই বাইরে লাফিয়ে পড়ল মাঝারি সাইজের এক গল্দা চিংড়ি।

'তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ'—গীতায় শ্রীভগবানের বাণী। জুতাহত চিত্তের ব্যথা ভুলে গিয়ে আমি চিংড়ির দিকে ধাবিত হলুম আর তপন—

—যাচ্ছে—যাচ্ছে—বলে দু নম্বর ছিপে লাগালো আর একটি ভয়াবহ টান।

বিদ্যুৎবেগে বঁড়শী আকাশে ধাবিত হলো এবং একটি চিৎকার শোনা গেল: ক্যাঁ—কঁক্! মাছে ক্যাঁ-কঁক্ করে ডাকে নাকি? এমন তো কখনো শুনিনি। গলদা চিংড়ি ভুলে গিয়ে আমি ফিরে তাকালুম। এবারেও বঁড়শিতে আর একটা কালো রঙের বস্তু। না—আর এক পাটি জুতো নয়! রীতিমতো জীবন্ত একটা প্রাণী। ক্যাঁ ক্যাঁ করে উড়ছে এবং আমাদের মাথার চারপাশে ঘুরপাক খাচ্ছে সে।

রোমাঞ্চিত কলেবরে মুগ্ধ স্বরে আমি বললুম, উড়ুক্কু মাছ!

—তোমার মাথা—তপন বিকট রকম মুখ ভ্যাংচালো: দেখতে পাচ্ছ না! ওটা কাক!

—কাক!—শুনে আমার কেমন ভিরমি লেগে গেল: কাক কি জলে থাকে? অবশ্য কাকের অসাধ্য কিছু নেই, কিন্তু সে যে জলচর প্রাণীও বটে একথা তো কোনোদিন—

—থামো! কী যে বকছ তার ঠিক নেই!—তপন ঘ্যাঁৎ করে একটা আওয়াজ ছাড়ল: জলচর হবে কেন? উড়ে যাচ্ছিল —বঁড়শিতে ডানা আটকে গেছে। এখন বোঝো ঠ্যালা!

আমি কাকের মতোই হাঁ করে সেই উড়ন্ত জয়ধ্বজার মতো কাকের দিকে তাকিয়ে রইলুম। কেদার বাড়ুজ্যের উপন্যাসে পড়েছিলুম কার ছিপে যেন ঝুলন্ত বাদুড় আটকে গিয়েছিল। কিন্তু বঁড়শিতে উড়ন্ত কাক ধরা একমাত্র তপনের পক্ষেই সম্ভব—তার মতো প্রতিভাবানই কেবল এমন কীর্তি অর্জন করতে পারে।

বলতে যাচ্ছি ধন্য ধন্য—কিন্তু—কাকের ঝটপটানি আর বিশ্রী ক্যাঁ-ক্যাঁ আওয়াজে ততক্ষণে শ-দেড়েক কাক বিকট কোলাহলে জড়ো হয়ে গেল সেখানে। আর ব্যাপারটা ভালো করে অনুধাবন করার আগেই আমার ব্রহ্মতালুতে খটাস্ খটাস্ করে গোটা কয়েক ঠোকর পড়ল। মোটেই মনোরম বোধ হলো না সেগুলো!

—আরে—আরে—

তপন হাহাকার করে উঠল: দাঁড়িয়ে আছো কী? সমবেত আক্রমণ! ঠুকরে মাথা ফুটো করে দিলে! পালাও—পালাও—

বলবার দরকার ছিল না। তার আগেই দুজনে ছুটেছি। ঘরে ঢুকে ধড়াস করে দরজা বন্ধ করে দিয়ে তবে নিষ্কৃতি।

কাকের কলধ্বনি থামল প্রায় পনেরো মিনিট পরে। সাবধানে বাইরে বেরিয়ে দেখি 'অল কোয়ায়েট অন দি ফিশিং ফ্রন্ট!' ছিপটার অর্ধেক সুতো নেই, কাকেরা নেই, সেই গলদা চিংড়িটাও নেই। কেবল সেই প্রকাণ্ড জুতোটা। যুদ্ধক্ষেত্রের একটি স্মারক-স্তম্ভের মতো আমাদের দিকে প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে তপন বললে, ওঃ!

জুতোর ঘা লেগে কপালের একটা দিক আমার ফুলে উঠেছিল, কাকের ঠোকরানিতে মাথাও জ্বালা করছিল বিলক্ষণ। তবু তপনের জন্যে সহানুভূতি হচ্ছিল আমার। সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, দুঃখ কোরো না ভাই, অন্তত একটা চিংড়ি মাছও তো তুমি ধরেছিলে!

—হুঁ।

—আর একটা উড়ন্ত কাক। পৃথিবীতে তুমিই সেই প্রথম ব্যক্তি যে ছিপ দিয়ে আকাশ থেকে কাক ধরেছে। এই গৌরবের কথাও তো ভোলবার নয়।

—থামো!

এক চিৎকারে আমাকে থামিয়ে দিয়ে তপন সেই জুতোটার দিকে তাকিয়ে রইল। তাকিয়ে রইল দার্শনিকের মতোই।

রাধেশ্যাম দিব্যি খিচুড়ি আর ডিম ভাজা রান্না করেছিল। খেয়ে শরীরটা এলিয়ে এল। চারদিকের শ্যামলিমা পান করে, জুতোর ঘা খেয়ে এবং কাকের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরিশ্রমটাও নেহাত কম হয়নি। একটা তক্তপোশের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লুম।

হাঁড়ির মতো মুখ করে একটা চেয়ারে বসে আছে তপন। কপালে ভ্রুকুটি।

—ওহে, শুয়ে পড়ো, জিরিয়ে নাও একটু।

—হুঁ।—তপন আমার দিকে ফিরে তাকালো : আচ্ছা, পাঁচটা গলদা চিংড়ি পাওয়া গেলে কেমন হয় বলো তো ?

পাঁচটা গলদা চিংড়ি। শুনে কেমন খটকা লাগল।

—পাবে কোথায় ?

—ধরো যদি পাওয়াই যায় ?

—তা হলে খাওয়াও যায়। কিন্তু পাচ্ছ না যখন, তখন মিথ্যে মন খারাপ করে কী হবে ? বরং একটু ঘুমিয়ে নিলে—

—তুমি ঘুমোও।—গোঁজ হয়ে জবাব দিলে তপন।

দিব্যি ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছিল, কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। যখন জেগে উঠলুম, বিকেলের রোদ লাল হয়ে এসেছে। আর দেরি নয়—এবার ফিরতে হবে।

কিন্তু নামতে গিয়ে দেখি জুতো জোড়া নেই।

কোথায় গেল জুতো ? নতুন কিনেছি—একমাসও হয়নি। চুরি-টুরি গেল নাকি ? কী সর্বনাশ !

ছুটে বেরিয়ে এলুম। দেখি, পুকুরঘাটে তপন বসে আছে পরমহংসের মতো।

ব্যাকুল হয়ে বললুম, ওহে, তোমার রাধেশ্যাম কোথায় ?

—সে চায়ের জন্যে গরম সিঙাড়া আনতে গেছে : কেন—কী দরকার তাকে ?

—দরকার তাকে নয়—আমার জুতো জোড়াকে। নিয়ে পাচার করল নাকি ?

—ছিঃ—ছিঃ ! রাধেশ্যাম জুতো চুরি করে না। তোমার জুতো আমার কাছেই আছে।

—আছে ? বাঁচালে !—আমি কাতর হয়ে এগিয়ে এলুম, কই কোথায় ?

তপন প্রশান্ত হাসি হেসে বললে, ওই পুকুরে।

—অ্যাঁ।—

—শুধু তোমারই নয়—আমার জোড়াও আছে সেই সঙ্গে। —একটা স্বর্গীয় দীপ্তিতে তপনের মুখ উদ্ভাসিত : আর সেই বড়ো জুতোটাও। প্রায় দু ঘণ্টা আগে দড়ি বেঁধে ছেড়েছি। পাঁচটা গলদা চিংড়ি অন্ততঃ পাবই—কী বলো ?

আমি ধপাস করে ঘাটলার ওপর বসে পড়লুম। তপনের জুতোর দাম আমার জানা নেই—কিন্তু আমি আঠারোটি নগদ টাকা দিয়ে অনেক শখ করে কিনেছিলুম !

তপন আবার সেই স্বর্গীয় হাসি হেসে বললে, কিচ্ছু ভেবো না ভাই—সাতদিন পরে এসে টেনে তুলব। তার ভেতর চিংড়িরা নিশ্চয় এসে বাসা করবে ওতে। খালি হাতে আর ফিরে যেতে হবে না। এই বুদ্ধিটাই বেশ ভালো হয়েছে—নয় কি ?

আরো একটা ভালো বুদ্ধি আছে আমার মনে হলো—সেটা এই মুহূর্তে একটি হত্যাকাণ্ড ঘটানো। কিন্তু এক জোড়া জুতোর জন্যে বন্ধুকে তো আর সত্যিই খুন করা যায় না!



অভ্যর্থনা

তপন বললে, টু বি ফ্র্যাঙ্ক, আবার প্যা—প্যা—প্যাচে পড়া গেলছে!

প্যাচে পড়বার এবং পড়াবার একটা স্বাভাবিক শক্তি তপনের আছে, সুতরাং আমি খুব বিচলিত বোধ করলুম না। ওর দিকে একবার তাকিয়েই তক্তপোশের ওপর সাজানো পেশেন্সের তাসগুলোকে অনুধাবন করে চললুম।

—আমি মরছি নিজের জ্বালায়, আর তোমার খালি তাস আর তাস!—চটে গিয়ে তপন তাসগুলোকে এলোমেলো করে ছড়িয়ে দিলে। হাঁ-হাঁ করে ওঠবারও সময় পাওয়া গেল না।

—ভালোও লাগে এ-সব! যেমন রাবিশ তোমার গল্প, তেমনি বিশ্রী তোমার হ্যাবিট। এত কুঁড়েমি করতেও পারো!

অগত্যা তাসগুলো গুছিয়ে তুলে ফেলতে হলো। বললুম, সকালবেলাতেই একেবারে মার্-মার্ করে ছুটে এসেছ যে। ব্যাপার কী?

—মাথা আর মুণ্ডু! ভারী মুশকিল হয়েছে সুকুমার। মিসেস ঘো-ঘো-ঘো—

—মিসেস ঘো—ঘো আবার কে?

—ঘো-ঘো নয়—ঘোষাল!—এতক্ষণে তপন নামটাকে সম্পূর্ণ ওগরাতে পারল: এখানকার গার্লস্ স্কুলের নতুন হেড-মিস্ট্রেস। আজ বিকেলে তিনি আমাদের বাড়িতে আসছেন।

—কেন?—এইবার আমার মনে সন্দেহের ছায়া পড়ল: তুমি কি তাঁর স্কুলে চাকরি চাও? তোমার ব্যাঙ্কের চাকরিটা তো নেহাত মন্দ নয়! নাকি ভর্তি হতে চাও আবার? কিন্তু বি-এ পাস করবার পরে স্কুলে কি আবার ভর্তি হওয়া যায়? তা-ও মেয়েদের স্কুলে? তার ওপর তোমার মুখে তো আবার গোঁফও রয়েছে। ওই গোঁফসুদ্ধ তোমায় ভর্তি করতে কি উনি রাজী হবেন?

তপন এবার দস্তুরমতো—যাকে বলে—গর্জন করল।

—লুক হিয়ার সুকুমার, সব সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না।

—কোন্ কোন্ সময় ভালো লাগে? বলে ফেলো—নোট করে রাখি।

—অল্ রাইট্, আমি চলে যাচ্ছি—

চলেই যাচ্ছিল, আমি খপ করে ধরে ফেললুম।

—বোসো, বোসো—ঠাণ্ডা হও। ঘোলের সরবত আনিয়ে দিই।

—হ্যাং ইয়োর ঘো-ঘো—

—ঘাল?

—না, সরবত। ওদিকে মিসেস ঘো-ঘো-ঘো—

—ঘোল?

—না—না—হেড-মিস্ট্রেস। সত্যি ভাই, খুব মুশকিল হয়েছে। কী যে করি, বুঝতে পারছি না।

তপনের মুখের চেহারা দেখে এবারে আমার মায়া হলো: কী হয়েছে বলো তো?

বিশদ বিবরণটা জানা গেল এতক্ষণে। মিসেস ঘোষাল তপনের মা-র বাল্যসখী। একই স্কুলে দু-জনে পড়তেন। তপনের মা ক্লাস টেন পর্যন্ত এসেই থমকে যান, মিসেস ঘোষাল টক টক করে বি-এ পাস করেন। মিস্টার ঘোষালকে বিয়ে করেছিলেন, কিন্তু সে ভদ্রলোক বছর সাতেক পরেই আফ্রিকা না আমস্টারডাম কোথায় একটা কাজ জুটিয়ে উধাও হয়েছেন। কারণ আর কিছু নয়, ভদ্রমহিলার পরিচ্ছন্নতার বাতিক অসাধারণ। প্রত্যেকটি জিনিস টিপ-টপ রাখা চাই। চেয়ারে পা তুলে বসলে প্রলয় ঘটাবেন, টিপয়ের ফুলদানি আধ ইঞ্চি এদিক ওদিক হলে ঝিয়ের চাকরি যাবে, খাওয়ার সময় কেউ হুশ-হাশ আওয়াজ করলে টেবিল ছেড়ে উঠে যাবেন। শোনা যায়, দিনে চার বার দাঁত মাজতে আপত্তি করাতেই নাকি শেষ পর্যন্ত মিস্টার ঘোষালকে প্রাণ নিয়ে উগাণ্ডা কিংবা

উরুগুয়েতে পালাতে হয়েছে। এসব রোমাঞ্চকর কাহিনী তপন তার মা-র মুখেই শুনেছে।

—এ রকম ভয়ানক জীবকে তুমি বাড়িতে আসতে বললে কেন?

—আরে, আমি বলেছি নাকি? কাল একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে ব্যাঙ্কে এসেছিলেন। এ-কথা সে-কথার পরেই ফস্ করে চিনে ফেললেন! বললেন, 'ও, তুমি লোকনাথবাবুর ছেলে? তোমার মা-র নাম তো মালতী? আরে মালতী তো আমার ছেলেবেলার সই, সুরবালা বললে তখুনি চিনে ফেলবে।' আমি বুঝতে পারলুম এই সেই সাংঘাতিক মিসেস ঘোষাল। আর উনিও সঙ্গে সঙ্গে নাক কুঁচকে বললেন, 'তুমি নস্যি নাও কেন? ছি—ছি—খুব ন্যাস্টি অভ্যেস। ওসব ছেড়ে দাও।'

—তার পরেও তুমি ওঁকে আসতে বললে?

—দুত্তোর!—তপন আবার চটে উঠল: আমি কি পা-পাগল? নিজেই বললেন, 'আমি কাল সন্ধ্যের দিকে যাব তোমাদের বাড়িতে।' আমি বললুম 'বাবা মা কেউ এখানে নেই—দু মাসের জন্যে হরিদ্বারে গেছেন, একেবারে কুম্ভ-স্নান সেরে ফিরে আসবেন।' উত্তরে বললেন, 'কেন, তুমি তো আছো। আমি তোমাদের বাড়ি দেখতে যাব। কিন্তু খবরদার, চা-জলখাবারের ব্যবস্থা কোরো না। আমি যখন-তখন যা-তা খাইনে।'

—যাক, এক দিক থেকে বাঁচোয়া।

—তা বটে। কিন্তু ভাই, এই মাসখানেকের ভেতরে বাড়ি-ঘরের অবস্থা তো সঙ্গীন। ঝুল-ধুলোর জন্যে ভাবছি না—ও ঝেড়ে-টেড়ে সাফ করা যাবে। কিন্তু আর সব যা হয়ে রয়েছে তাই—রেগুলার সুন্দরবন! চাকরটা আবার পরশু দেশে পালিয়েছে—এই সেভেনথ্ টাইম ওর চাচা মারা গেল। একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ হে? ওদের অনেক চাচা থাকে আর তারা খুব কুইকলি

মারা যায়।

আমি চিন্তা করে বললুম, হুঁ, চাচাদের মৃত্যুর হার খুব বেশী। যাক, ও নিয়ে তুমি কষ্ট পেয়ো না—তোমার আর তো চাচা নেই। তা এখন কী করতে চাও?

—তুমি আমাকে হেল্প করো। বিপদে বন্ধুর কাছেই আসতে হয়।

আমি আবার ব্যাপারটা চিন্তা করে দেখলুম। তারপর বললুম, তোমার সেই যে মুখোশটা—মানে সেই অয়েল মাস্ক—সেটা এখনো আছে নাকি? যদি থাকে, তা হলে আমি বরং সেইটে পরে সন্ধ্যেবেলা তোমাদের বাগানে দাঁড়িয়ে থাকব। মিসেস ঘোল, আই অ্যাম সরি—মিসেস ঘোষাল গেটে ঢুকতেই একটা তাড়া লাগাব বোঁ তক করে। ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাবেন এবং তুমিও—

তপন তড়াক করে উঠে দাঁড়ালো। রেগে বললে, তোমার সঙ্গে কথা বলাই ঝ-ঝ-ঝকমারি। যা পারি, একাই করব। কারুর সাহায্য আমার দরকার নেই।

আমি বললুম, কারেক্ট। একেই বলে তেজ। তোমার কথা ভেবেই তো বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'হে বীর সাহস অবলম্বন করো—'

তপন দরজাটা দড়াম্ করে আছড়ে বেরিয়ে গেল—যেন বেশ রোমাঞ্চকর নাটকের প্রথম দৃশ্যে যবনিকা পড়ল। আর যবনিকা পড়ে ভালই হলো, কারণ বিবেকানন্দের বাণী থেকে ওই একটিমাত্র লাইনই আমার মুখস্থ। ম্যাট্রিক থেকে বি-এ পর্যন্ত বাংলার সব পরীক্ষাতেই রচনা লিখতে গিয়ে 'এই জন্যই কবি গাহিয়াছেন' বলে ওই লাইনটাই আমি চালিয়ে দিয়েছি।

কিন্তু বিকেলে অফিস থেকে মেসে ফিরেই মনটা কি রকম

চিড়বিড় করতে লাগল। যেন একটা আরশোলা বেরিয়ে এসে ক্রমাগত আমার পায়ে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। শেষে বুঝতে পারলুম, ওটা আরশোলা নয়—বিবেক। তপনের এই দারুন দুঃসময়ে বন্ধু হিসেবেও অন্তত আমার ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ানো উচিত।

অতএব বেরিয়ে পড়া গেল।

দরজার কড়া নাড়তে হলো না—দেখি সামনেই দাঁড়িয়ে। মুখে ভরাট খুশির হাসি—ওর পরিপাটি করে ছাঁটা সরু গোঁফ পর্যন্ত সেই খুশিতে চকচক করছে। বোঝা গেল, একটা স্বর্গীয় পরিতৃপ্তিতে ও উদার হয়ে আছে—আমার ওপর এতটুকুও রাগ নেই এখন।

হেসেই বললে, ক'টা বেজেছে হে ?

ঘড়ি দেখে বললুম, সাড়ে পাঁচটা।

—তা হলে মিসেস ঘো-ঘো—

—ঘোল বলতে চাইছ ?

—না-না—ঘোষাল পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বেন। দেখে যাও কেমন সাজিয়েছি বসবার ঘরটা। তোমার মনে হবে যেন কলকাতার আর্টিষ্টি হাউসে এসে ঢুকেছ।

—রিয়্যালি ?—শিহরিত হয়ে আমি ভেতরে পা দিলুম।

মেজেতে কার্পেট পাতা। চেয়ার-টেবিলগুলো চক-চক ঝক-ঝক করছে। একটা ফুলদানিতে গোটা কয়েক গাঁদা ফুল সাজানো।

তপন দারুন খুশী হয়ে গোঁফে তা দিলে। বললে, দেখছ কী ? আজ ছুটি নিয়েছিলুম অফিস থেকে। সারা দুপুর বসে বসে চেয়ার-টেবিল বার্নিশ করেছি।

—বার্নিশ করেছ ? তুমি ?—তপনের ওপর আমার ভক্তি বেড়ে গেল : এ বিদ্যেও তোমার আছে নাকি ?

—বিদ্যে থাকে নাকি ?—তপন হে-হে করে হাসল। অ্যাকোয়ার

করতে হয়। বললে বিশ্বাস করবে না—জীবনে এই আমার প্রথম বার্নিশ। আর ফর্মুলাটা—কী বলে গিয়ে—একেবারে ওরিজিন্যাল!

—অ্যাঁ।

—হুঁ-হুঁ—পরে বলব। আচ্ছা, এবার দেয়ালের দিকে তাকাও।

আমি তাকালুম এবং লাফালুম। তৎক্ষণাৎ।

—এসব কি হে?

—ছবি।

—কার ছবি? কিসের ছবি?

—কিসের ছবি? আমি তার কী জানি? কিন্তু কেমন দেখাচ্ছে তাই বলো।

বললুম, বুঝতে পারছি না ভাই। মাথা ঘুরছে। ওটা কি হে? গোবরের গাদা নাকি?

—না, নীলবসনা সুন্দরী। তার পাশে কী আছে বলো দেখি?

আমি বললুম, একটা ভাঙা মোটর? না না, শ্যাওড়া গাছে পা দিয়ে মাথা নিচু করে একটা পেত্নী ঝুলছে বোধ হয়?

—ওটা প্রতীক্ষা। রাজকন্যা প্রাসাদশিখরে বসে আছে।

আমি গোটাকয়েক খাবি খেলুম। একটু সামলে নিয়ে বললুম, রাজকন্যা প্রাসাদশিখরে কেন প্রতীক্ষা করছে ভাই? ঘুড়ি ধরতে চায় নাকি?

তপন ব্যাজার হয়ে বললে, ঘু-ঘুড়ি ধরবে কেন? রাজপুত্র পক্ষীরাজে আসবে কিনা, সেই জন্যে ওয়েট করে রয়েছে।

—অ-অ।

—তার এধারে যেটা দেখছ—

—থাক থাক—আর দরকার নেই। যা বলেছ ভাই, কলকাতার আর্টিস্ট্রি হাউস এর কাছে একেবারেই নাবালক। কিন্তু এসব মডার্ন

আর্ট রাতারাতি তুমি পেলে কোথায় ?

—পাব আবার কোথায় ? নিজেই আঁকলুম বসে বসে

—অ্যাঁ !

মাথা ঘুরে পড়েই যাচ্ছিলুম, অনেক কষ্টে সামলে নিতে হলো। তপনের মুখটা আমি ভালো করে দেখতে পেলুম না—শুধু ওর পরিপাটি ছাঁটাই করা গোঁফ জোড়াই নাচতে লাগল চোখের সামনে।

—আমারও প্রথমে খেয়াল হয়নি—তপন বলে চলল, ঘর সাজাতে সাজাতে হঠাৎ নজরে পড়ল। দেখি দেওয়ালে রাধাকেষ্ট. কালীঘাটের পট, মা-র বোনা কার্পেটের 'পতি পরম গুরু', কোন্ এক সায়েবের সঙ্গে তোলা বাবার অফিসের এক পেল্লায় গ্রুপ ফটো। রাবিশ। এসব দেখলে মিসেস ঘো-ঘো—

—ষাল—

—হ্যাঁ, ঘোষাল নিশ্চয় মাথা ঘুরে পড়ে যেতেন। তাই ভাবলুম, নিজেই যা পারি করে ফেলি। মডার্ন আর্ট তো কেউ বোঝে না. আমার ছবি দিয়েই কি-কি-কি—

—কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড করতে চাও ?

—না, কিস্তিমাত করতে চাই। ব্যস্—লাল-নীল পেন্সিল, কালি, এই সব নিয়ে বসে গেলুম। বললে বিশ্বাস করবে না মাত্র দু ঘণ্টায় বা-বারোখানা ছবি ম্যানেজ করে ফেলেছি। কী মনে হয় তোমার ? ইম্প্রেসড্ হবেন ভদ্রমহিলা ? মানে মিসেস ঘো-ঘো—

আমি ঘোষাল বলতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু আর বলা গেল না। পৃথিবীতে অনেক রকমের শক্ আছে—কোনোটা সহ্য করা যায়, কোনোটা স্রেফ ধরাশায়ী করে ফেলে মানুষকে। আমার গলায়

শুকিয়ে উঠল, বোঁ বোঁ করতে লাগল মাথার ভেতরে। দেখলুম, সামনেই টিপয়ের ওপর একটা কাঁচের জগে লাল রঙের কী রয়েছে। নিশ্চয় সরবৎ। ওরই এক গ্লাস খাওয়া যাক—নইলে তপনের কলাচর্চার এই গদাঘাত আমি সইতে পারব না।

গেলাস কই? গেলাস নেই। জগ সুদ্ধ তুলে গলায় ঢালতে যাচ্ছি, হাঁ-হাঁ করে সেটা কেড়ে নিলে তপন।

—আরে আরে—খেয়ো না, খেয়ো না! মারা পড়ে যাবে।

—মারা পড়ব? কেন? সরবত খেয়ে কেউ কখনো আবার মারা পড়ে নাকি?—আমি আবার হাত বাড়ালুম।

—কে বলেছে তোমায় সরবত?—জগটা নিয়ে তপন চট্ করে সরে গেল নাগালের বাইরে: ও তো কালি-মেশানো লাল জল। ওর ভেতরে রয়েছে দু-দুটো জ্যান্ত ট্যাংরা মাছ—খাঁ করে একটা গলায় ঢুকে গেলেই আর দেখতে হবে না। মানে, মিসেস ঘো-ঘো-ঘো—মরুক গে, সেই ভদ্রমহিলাকে চমকে দেবার জন্যে একটা অরিজিন্যাল অ্যাক্অ্যাক্-অ্যাক্যু—কথাটা বলবার জন্যে তপন আঁকু-পাঁকু করতে লাগল আর আমি বিধ্বস্ত হয়ে ধপাত করে সামনের চেয়ারটাতেই বসে পড়লুম। আর বসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো, তপনের এই আর্টিস্টিক হাউসে আরো মিনিট দুয়েক থাকলেই একটা শোচনীয় দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। হয় আমি প্রাণ নিয়ে পালাব—নইলে আমার জান বেরিয়ে যাবে: আমাকে জানান না দিয়েই। ভেবে-চিন্তে দেখলুম, আমার দিক থেকে প্রথমটাই সুবিধে এবং আমি উঠে দাঁড়াতে গেলুম।

কিন্তু সংসারে বসে পড়া যত সহজ, উঠে দাঁড়ানো তার চেয়ে ঢের কঠিন। দেখলুম চেয়ারটার দুটো অভিসন্ধি। হয় আমাকে টেনে রাখতে চায়—নইলে আমার সঙ্গে উঠে আসতে চায়। কোনো মতলবটাই তো ভালো বলে বোধ হচ্ছে না! একটা কুটিল সন্দেহে আমার মন ভরে গেল।

—ব্যাপার কি হে তপন? তোমার চেয়ার যে আমায় ছাড়তে চায় না! এর মানে কী?

—ছাড়তে চায় না?—তপন তার সরু গোঁফ আলো করে মনোরম একটি হাসি হাসল: ও কিছু নয়—বার্নিশ!

—কিছু নয়, বার্নিশ? এ কিসের বার্নিশ? চেয়ারের সঙ্গে চেপে ধরবে বার্নিশের এত বাড়াবাড়িই বা কেন?—মরিয়া হয়ে দাপাদাপি শুরু করে দিলুম আমি। পরিষ্কার বুঝতে পারলুম, এই চেয়ার ছাড়বার আগে অনেকখানি জামাকাপড় এবং বেশ কিছুটা ঘাড়ের চামড়ার মায়া আমায় পরিত্যাগ করতে হবে। আর একসঙ্গে এতখানি ত্যাগস্বীকার আপাতত সম্ভব নয় বলেই মনে হলো আমার।

তপন উৎসাহ দিয়ে বললে, ট্রাই—ট্রাই এগেন, ঠিক উঠে পড়বে। মানে গঁদের আঠাটা একটু বেশী পড়ে গেছে কিনা, তাইতেই—

—গঁদের আঠা!

—ইয়ে, ওই গঁদের সঙ্গে লাল জুতোর কালি মিশিয়েই বার্নিশটা তৈরী করেছিলুম কিনা! আমার ওরিজিন্যাল ফর্-ফর্-ফর্—

ওর ফর্-ফর্ শুনে প্রাণ ধড়ফড় করে উঠল আমার। আমি হাহাকার করে বললুম: তুমি ক্রিমিন্যাল—তোমার ফাঁসি হওয়া উচিত। তার পরেই 'টু বী অর নট টু বী দ্যাটস্ দ্য কোশ্চেন!' সমস্ত ইচ্ছাশক্তি দিয়ে ভাবতে চেষ্টা করলুম, আমি হাউই—আমি উল্কা—আমি রকেট্—আমি ভস্টক নম্বর ফিফটি ফাইভ! একটি উল্লম্ফন, আমার আর্তনাদ এবং ছিটকে উঠে দেওয়ালে ঠিকরে পড়া! 'আমি অবসান—নিশাবসান!'

নাকে চোট লেগেছিল দারুন, কিন্তু কাপড়-জামার দিকে তাকিয়ে সে ব্যথা নিতান্তই মরীচিকা বলে বোধ হলো। দেখি, জামা-কাপড় বার্নিশের রঙে-একাকার। আর পাঞ্জাবির খানিকটা অংশ জয়ধ্বজার মতো উড়ছে চেয়ারের গায়ে—আদ্দির নতুন জামাটা

এক-ধোপের বেশী গায়ে পরিনি!

আমি চ্যাঁ-চ্যাঁ করে আর্তনাদ করলুম: আই সে তপন, আমি তোমার নামে কেস করব।

তপন কী বলতে যাচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গেই বাইরে থেকে ভারিক্কী মেয়েলী গলার ডাক এল: তপন আছো—তপন?

—এসে গেছেন!—তপন চিড়বিড়িয়ে উঠল: আসুন মাসীমা, আসুন।—তারপর ধিক্কার-ভরা গলায়—যেন সব অপরাধ আমার—এমনিভাবে বলে চলল: ছি-ছি, কী একটা সীন ক্রিয়েট করলে? আর কার্পেটটাও কী বিশ্রীভাবে কুঁচকে দিলে ওদিকে—রাম রাম!

রাগের মধ্যেও বলতে যাচ্ছিলুম, ভদ্রমহিলা ঘরে ঢোকার আগে ওই মারাত্মক চেয়ার তিনটে সরাও, কার্পেট নয় পরেই হবে; কিন্তু ঠিক তক্ষুনি একই সঙ্গে দুটো ঘটনা ঘটল—যাকে বলে ডবল অ্যাক্‌শন! তপন এধার থেকে কুঁচকে যাওয়া কার্পেটে জোরে একটা টান মারল আর ওদিক থেকে চৌকাট পেরিয়ে সেই মুহূর্তে ঘরে পা দিলেন মিসেস ঘে-ঘো—ঘোষাল। চকিতের জন্যে আমি দেখতে পেলুম একখানা গোল মুখ, কালো ফ্রেমের এক জোড়া বিরাট চশমা, একটা চওড়া শাড়ির পাড়, একটি ঝুলন্ত ভ্যানিটি ব্যাগ এবং পরক্ষণেই কানে এল একটি তীক্ষ্ণ চিৎকার: ও মা গো!

গোল মুখখানা, চশমা, ব্যাগ এবং একটি বপু মুহূর্তের মধ্যে দেখা দিয়েই দ্বিগুণ বেগে দরজার বাইরে অদৃশ্য হলো। জুতোপরা এক জোড়া পা একবার শূন্যে নেচে উঠল, ধপাত করে কী যেন আছড়ে পড়ল, সিঁড়ি বেয়ে কে যেন ডিগবাজি খেলো, তার পরেই অল্ কোয়ায়েট অন্ দি ফ্রন্ট ডোর! মিসেস ঘোষাল হয়ে যিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, মিসেস ঘোল হয়ে গড়িয়ে চলে গেলেন তিনি।

এমনিই হয়ে থাকে—অন্তত বিজ্ঞান তাই বলে। কার্পেটের

কোণায় পা থাকলে এবং সেই অবস্থায় কার্পেটে একটা হ্যাঁচকা টান পড়লে সেই পদাধিকারী কিংবা কারিণী—মাধ্যাকর্ষণের স্বাভাবিক নিয়মটা মানতে বাধ্য। চিরদিনই তা মেনে আসছে। তারই প্র্যাক্টিক্যাল ডেমনস্ট্রেশন দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইলুম।

বাইরে বাগান কাঁপিয়ে দ্রুত পদধ্বনি উঠছে। প্রাণ হাতে করে পালাচ্ছে কেউ—তাকে ফার্স্ট এইড নেওয়ানো যাবে বলেও মনে হলো না।

তপন কার্পেটের ওপরে বসে পড়েছে—তারই আঁকা ছবির সেই গোবর-গাদা—না—না—নীলবসনা সুন্দরীর মতো। আমি বলতে যাচ্ছিলুম, অন্তত ভদ্রমহিলা এ যাত্রা তোমার মারাত্মক চেয়ারের হাত থেকে তো বেঁচে গেলেন—কিন্তু সব সান্ত্বনাই দেওয়া কী যায় সব সময়ে? আরো নিজের নতুন পাঞ্জাবির আধখানা চেয়ারের গায়ে ধ্বজার মতো শোভা পাচ্ছে যখন?



একটি মোটর যাত্রা

দরজার বাইরে ঘট-ঘট-ঘটাস করে বিরাট আওয়াজ হলো একটা। মনে হলো, গোটা দশেক গুড়ের হাঁড়িকে এক পেল্লায় লাঠির ঘা বসিয়ে চৌচির করল কেউ। কিন্তু বাধ্যতামূলক সঞ্চয়ের হিসেব কষতে গিয়ে সকাল থেকে আমার মাথা ঘুরছে, কাজেই গুড়ের হাঁড়িই ফাটুক আর মফস্বল শহরের বিখ্যাত গোল গাড়িই উলটে যাক—ও সব ভাববার সময় আমার ছিল না।

কিন্তু পরক্ষণেই ঘরে ঢুকল তপন। আমার পরম বন্ধু তপন চৌধুরী। নাকের নিচে সেই মোলায়েম সরু গোঁফ, মুখে মাখন মার্কা হাসি—পরনে চোঙার মতো কালো রঙের ট্রাউজার—নর্দমা ব্র্যাণ্ড গোছের কী একটা নাম।

—কিহে, গ-গল্প লিখছ নাকি? বেড়ে আছো!

পিত্তি জ্বলে গেল তপনের হাসি দেখে।

—গল্প লিখছি না, কমপালসারি সেভিংসের হিসেব করছি।

—ফেলে দাও হিসেব। এমন চ-চমৎকার সকাল—ছুটির দিন—এই কি হিসেব লিখবার সময়? উঠে পড়ো, উঠে পড়ো হে সু-সু-সু-কৃ—

বিরক্ত হয়ে বললুম, আমি শুশুক নই—আমি মানুষ। আমার নাম সুকুমার।

—যে-রকম মুটিয়ে যাচ্ছ তাতে তোমাকে শু-শু-শুক বললে অন্যায় হয় না।—তপন একগাল হাসল: ওঠো।

—কোথায় উঠব?

—গা-গাছে। হলো তো? এবার তপনও চটে উঠল: গাছে চড়ে কি-কি-কিচ কিচ করতে থাকো।

—শুশুক গাছে ওঠে না।—গম্ভীর হয়ে আমাকে জানাতে হলো: তাকে কোনোদিন কিচকিচ করতেও শোনা যায়নি।

—না হয় তুমিই একটা এগ-এগ-এগ—কিন্তু তপনের 'এগ' অর্থাৎ ডিমটিকে আর ফুটতে দেওয়া যায় না। বাধা দিয়ে বললুম,

এ:গর কথা প:রে হবে। ইচ্ছে হয়, তুমি মনের আনন্দে তা দাও গে। আপাতত আমাকে ছাড়ো—আমি হিসেবটা করে ফেলি।

—ধ্:ত্তোর হিসেব!—তপন হ্যাঁচকা টানে আমাকে চেয়ার থেকে তুলে ফেলল: চলো শীগগির।

একেবারে মরিয়া হয়ে এ:সেছে। আর তপনের যখন একবার গোঁ চাপে তখন যে তাকে কোনোমতেই ঠেকানো যায় না, সে আমি আগে অ:নেকবার দেখেছি।

কোথায় যেতে হবে?

—বেড়াতে। এমন লা-লাভলি সকাল। আকাশ মেঘলা, পূবের হাওয়া দিচ্ছে, অফিস বন্ধ—এমন দিনে কেউ হিসেব লেখে? তুমি আবার নিজেকে সা-সাহিত্যিক বলো! এই জন্যেই তো সব কাগজ থেকে তোমার লেখা ফে-ফে-ফে—

হিটিং বিলো দি বেলট। আমি তারস্বরে বাধা দিলুম: সক্কালবেলাতেই ফ্যা ফ্যা কোরো না তপন, আমার মন-মেজাজ ভালো নেই। তোমার সঙ্গে আমি বেড়াতে যেতে পারব না—আমাব পা ব্যথা করছে।

—পায়ের দরকার নেই। মো-মোটর নিয়ে এসেছি।

—মোটর।—শুনে হঠাৎ দারুণ উৎসাহ বোধ হলো: একথাটা তো মন্দ নয়। পেলে কোথায়?

—ক্-কিনেছি। মাই কার।

—তোমার!—আমার বিষম লাগল একটা: বলো কিহে—একেবারে মোটর কিনে ফেললে! এত টাকা পেলে কোথায়?

—ভে-ভেরি চীপ। পুরোনো বটে, কিন্তু জাত বিলিতী গাড়ি। কাল কথাবার্তা বলে আজই কিনে ফেললুম। আর ডেলিভারী নিয়েই ছুটে এসেছি তোমার কাছে। চলো—চলো—বেশ খানিকটা বেড়িয়ে আসা যাক। এমন লা-লা-লাভলি সকাল—

আর বলতে হলো না—তৎক্ষণাৎ আমি পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়িয়ে ফেললুম।

আমার দরজার সামনেই তপনের গাড়ি দাঁড়িয়ে।

সেদিকে একবার তাকিয়েই আমার উৎসাহ অনেকখানি কুঁকড়ে এল। সেই পা-দানিওলা লম্বা গাড়ি—মাথার ওপরে চাঁদোয়ার মতো জরাজীর্ণ হুড, রামশিঙের মতো একটি প্রকাণ্ড হর্ন বেরিয়ে আছে একদিকে। তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো আমার মনে হলো, তা হলে একটু আগেই বারোটা গুড়ের হাঁড়ি একসঙ্গে ফাটবার মতো যে মনোরম আওয়াজ কানে এসেছিল—সেটি এই যন্ত্রেরই অবদান!

তপন আমার পাঁজরায় একটা খোঁচা দিয়ে বললে, কিহে, কেমন দেখছ?

বললুম, রোমাঞ্চকর।

—রো-রোমাঞ্চকর মানে?

—ভয়াবহ।

—তার মানে?

—ভাবছি হেনরি ফোর্ডের প্রথম গাড়িখানা যোগাড় করলে কোত্থেকে?

—ইয়ার্কি নয় সু-সু-সু—

—কুমার।

—থ্যা-থ্যাঙ্ক ইউ।—তপন কৃতজ্ঞ হয়ে বলে যেতে লাগল: দেখতে একটু পু-পুরোনো বটে, কিন্তু ক্-ক্লাস গাড়ি! তোমাদের এখনকার তকতকে ঝকঝকে গাড়ি দাঁ-দাঁড়াতে পারে এর পাশে! ম-মরা হাতীও লাখ টাকা।

—কিন্তু ভাই, মরা হাতীতে তো চড়া যায় না। আর আমি

এমনি একটু গুজব শুনেছিলুম যে লোকে চড়বার জন্যেই মোটরগাড়ি কিনে থাকে।

—এটাও চ-চড়বার জন্যেই কিনেছি, উঠেই দেখোনা একবার।

—চলবে ?

তপন দারুণ চটে গেল: তা হলে আমি এলুম কী করে? এটাকে ঠে-ঠেলাতে ঠেলতে এসেছি নাকি এখানে ?

—জানিনে ভাই। তুমি সব পারো। তোমার অসাধ্য কাজ নেই কিছু।

সেই চোঙার মতো ট্রাউজারের পকেটে হাত পুরে কিছুক্ষণ আমার দিকে অনুকম্পার দৃষ্টিতে চেয়ে রইল তপন। তারপর নাকে দিয়ে একটা বিশ্রী আওয়াজ করে বললে, উঠবে তো ওঠো—নইলে আমি চ-চললুম। তোমার সঙ্গে এঁড়ে ত-ত-তক্কো করে এমন সু-সুন্দর সকালটা আমি মাটি করতে চাইনে।

যা থাকে কপালে—একটা এসপার ওসপার হয়ে যাবে আজকে। আমি গাড়ির হ্যাণ্ডেল ঘোরালুম। ঘটাং-ঘট করে দরজা খুলল—যেন "খুলিল পশ্চিমদ্বার অশনি নিনাদে!" ড্রাইভারের পাশের আসনে ছেঁড়া কুশনে আমি গদিয়ান হয়ে বসলুম।

তপন গাড়ির চাবি ঘুরিয়ে সামনে থেকে হাত তিনেক লম্বা একটা হ্যাণ্ডেল বের করলে।

—এখন হ্যাণ্ডেল মারবে নাকি হে ?

—হুঁ। পু-পুরোনো গাড়ি কিনা—সেলফটা ঠিক করে নিতে হবে।

—ও, আচ্ছা।

ঘটাং-ঘটাং-থ। ঘট-ঘটাং-ঘট। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে তপন হ্যাণ্ডেল ঘোরাতে লাগল। গাড়ির ভেতরে এক-একটা করে ভূমিকম্প হচ্ছে মনে হলো, কিন্তু স্টার্ট নেবার কোনো সম্ভাবনা আছে বলে বোধ হলো না।

—কই হে স্টার্ট হচ্ছে না তো।

—হবে-হবে। পুরোনো গাড়ি কিনা—একটু সময় নেবে।

ঘট-ঘট-ঘটাং—ঘটাং-ঘটাং-ঘট—

তপনের ব্যায়াম দেখে আমার মন্দ লাগছিল না। মনে মনে ওকে উৎসাহ দিতে লাগলুম: মারো জোয়ান হেঁইয়ো—আউর থোড়া হেঁইয়ো—সাহেব মারেগা হেঁইয়ো—

রাস্তায় লোক জড়ো হচ্ছিল। কয়েকটি হাফ-প্যাণ্ট-পরা নাবালকের মুখে বিকশিত আনন্দের হাসি। দু-একটা টুকরো সরস মন্তব্যও যেন কানে আসছিল। মিনিট দশেক ঘটঘটানি সহ্য করে একলাফে নেমে কেটে পড়ব ভাবছি, হঠাৎ—

হঠাৎ মরা হাতীর গর্জন। আর মরা বলেই প্রেতলোকের গর্জন। অতটুকু গাড়িটার ভেতর থেকে যেন সাতটা ডিজেল এঞ্জিন একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল।

চারদিকে যে ভিড় জমেছিল—একলাফে ত্রিশ হাত পেছিয়ে গেল সেটা। গোটা দশেক কুকুর প্রাণপণে ডাক ছাড়ল। বিদ্যুৎবেগে তপন উঠে পড়ল গাড়িতে, হ্যাণ্ডেলটা ছুঁড়ে দিলে একপাশে, রামশিঙের মতো হর্ন থেকে গোটা কয়েক গগনভেদী শব্দ উঠল—তারপর—

তারপর এঞ্জিনে আর বডিতে ঝড়ের খঞ্জনী বাজিয়ে তপনের মরা হাতী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল! ধুলো উড়িয়ে, লোক-তাড়িয়ে, কুকুরদের গলায় অব্যক্ত বেদনার ব্যক্ত চিৎকার জাগিয়ে, দেখতে দেখতে মফস্বল শহরের লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে সোজা ঝাঁপিয়ে পড়ল আসাম রোডে। এবং আমাকে স্বীকার করতে হলো—হ্যাঁ, আদত বিলিতী গাড়ি বটে! চারদিকে জানান দিয়ে চলেছে দস্তুরমতো।

ছেঁড়া গদি থেকে কুশনের খোঁচাখুঁচি এক-আধটু লাগছিল না তা নয়, কিন্তু গাড়িটা যখন সত্যিই চলছে—দু-ধারের মেঘে ঢাকা

মাঠ আর পথের পাশের সার দেওয়া শিশু গাছ থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া এসে যখন চোখে মুখে আছড়ে পড়ছে, তখন ব্যাপারটা আমার ভালোই লাগল। -আর, পরের মোটর গাড়িতে চড়তে কার না ভালো লাগে!

—গাড়িটা তো নেহাত মন্দ নয় হে।

—হুঁ—হুঁ। খুব তো ঠাট্টা করছিলে তখন।

—বুঝতে পারিনি ভাই, নিজগুণে ক্ষমা করো। কিন্তু কী বলে ইয়ে—আওয়াজটা যেন একটু বেশি লাগছে কানে। ওর কোনো গতি করা যায় না?

—সাইলেনসার পাইপে ময়লা জমেছে। ওটা ঠিক করে নিলেই আওয়াজ থাকবে না।

—আর গদিটাও মানে—ঠিক যেন একরাশ পেরেকের ওপর বসে আছি ভাই। মানে, খুব আরাম হচ্ছে না।

—স্—স্—প্রীংগুলো খারাপ হয়ে গেছে। তা ছাড়া ধু-ধু-ধুতি পরেছ বলেই তোমার বেশি লাগছে। তোমাকে কতবার বলেছি ট্রা-ট্রা-ট্রা—

—ট্রাউজারের কথা বলছ?—আমার দীর্ঘশ্বাস পড়ল: ফোর্থ ইয়ারে পড়বার সময় একবার ট্রাই করেছিলুম। কিন্তু রাস্তায় বেরুতেই এমনভাবে কুকুরে তাড়া করল যে—

তপন খুশী হয়ে একগাল হাসল: তা যা বলেছ। সকলকে আবার ট্রা-ট্রা-ট্রাউ—মানে—মানায় না। তোমার ওই নাদুস-নুদুস চালকুম্-কুম-কুম—

ওর কুম্-কুম্ শুনতে শুনতে আমি বিরক্ত হয়ে মুখ ফেরালুম। নিজের চেহারা নিয়ে এ-সব সমালোচনা আমার ভালো লাগে না। গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলুম, তপনের গাড়ির আওয়াজে মাঠের ভেতরে বিপর্যয় ব্যাপার চলছে একটা। গোরু-ছাগলের পাল ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে চারদিকে। প্রকাণ্ড একটা

খইয়ের বস্তার গন্ধমাদন মাথায় করে ভালোমানুষ চেহারার একজন গুটিগুটি হেঁটে যাচ্ছিল, একটা গরুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সে বস্তাসুদ্ধ হুড়মুড় করে পড়ে গেল।

তপন নির্বিকার। যৎপরোনাস্তি বেসুরো গলায় সে উদাস হয়ে গেয়ে চলেছে :

'ওগো কর্ণধার,
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক,
ফিরবো না গো আর'

সর্বনাশ!

বাধ্য হয়ে তপনকে বাধা দিতে হলো তখন।

—ওকথা বলতে নেই ভাই। ফিরতেই হবে আমাকে। হিসেবটা এখনো করা হয় নি। তা ছাড়া কালকে অফিসও আছে।

—তু-তুমি তো ভারী বেরসিক হে! তপন চোখ পাকিয়ে আমার দিকে তাকালো : ওই জন্মেই তো সব কাগজ থেকে তোমার লেখা ফে-ফে—

বললুম, শাট্ আপ! বাংলাদেশে সত্যিকারের এডিটার আছে নাকি যে, আমার লেখার কদর বুঝবে? যেদিন নোবেল প্রাইজ নিয়ে আমাকে সাধাসাধি করবে, সেদিন টের পাবে আমি কি রকম লিখে থাকি। কিন্তু তার আগে আমার পা দুটো যে রোস্ট হয়ে গেল হে! তোমার এঞ্জিনে জল নেই নাকি?

—থাকবে না কেন? বেরুবার সময়ই তো জল নিয়েছি।

—তা হলে এমন গরম হয়ে গেছে কেন? পা রাখতে পারছি না যে!

—পু-পুরোনো গাড়িতে অমন হয়। যদি ট্রা-ট্রা-ট্রাউ—

—দুত্তোর ট্রা-ট্রা-ট্রাউ!—আমি সীটের ওপর পা তুলে আসন-পিঁড়ি হয়ে বসলুম। তৎক্ষণাৎ তপন ঘট করে কী একটা টানল—

আর খটাং করে সেটা এসে আমার হাঁটুতে লাগল। নিদারুণভাবেই লাগল।

আমি আর্তনাদ করলুম: গেছি—গেছি!

তপন বললে, তোমারই দোষ। আমি গীয়ার দিচ্ছিলুম, কোন্ আক্কেলে হাঁটুটা বাড়িয়ে দিলে শুনি?

চুলোয় যাক তোমার গীয়ার। গাড়ি থামাও—আমি ব্যাকসীটে যাব।

—ব্যা-ব্যাক্‌সীটে বসতে পারবে না। খা-খালি স্প্রীং!

আহত হাঁটুর পরিচর্যা করতে করতে আমি খেঁকিয়ে উঠলুম: আচ্ছা রসিকতা শুরু করেছ তো! পা নামিয়ে বসলে ফ্রাই হয়ে যাচ্ছি—তুলে বসলে গীয়ারের ঘা! গাড়ি থামাও—আমি নেমে যাব।

—একটু পা-টা সরিয়ে বোসো না। ইয়া—ঠিক হয়েছে। এইবার তাকিয়ে ছাখো—কী শ্যামল বনানী—কি রকম দি দি—দিগ-দিগ—মরুক গে, প্রান্তর, কেমন মে-মেঘলা আকাশ—

বলতে বলতেই গাড়ির মধ্য থেকে খটাং খটাং করে একটা বিজাতীয় শব্দ উঠতে লাগল।

চমকে বললুম, ওটা কিসের আওয়াজ হে?

তপন গম্ভীর হয়ে গেল।

—তাই তো! ওটা যেন ডি-ডি-ডি

—ডি-ডি-ডি মানে?

—ডি-ডিফারেনশিয়াল!

—ডিফারেনশিয়াল!—আমি আরো চমকে উঠলুম: ডিফারেনশিয়াল ক্যালকুলাস? কী সর্বনাশ—মোটরের মধ্যেও ক্যালকুলাস থাকে নাকি?—প্রবলভাবে মাথা নেড়ে প্রতিবাদ করে বললুম: না ভাই, এ আমি কিছুতেই বিশ্বাস করব না। তোমার এঞ্জিন খটাং খটাং শব্দে ক্যালকুলাসের অঙ্ক কষছে—এ কথা আমি কোনোমতেই

মানতে রাজী নই! ইয়ার্কিরও একটা লিমিট্ আছে!

তপন বললে, শাট্ আপ! মো-মো-মোটরের কিচ্ছুই জানো না তুমি।

—জানি নে তো বয়েই গেল। কিন্তু এঞ্জিনের ভেতরে যে ক্যালকুলাসের অঙ্ক থাকে—

—আঃ, থামো। ক্যা-ক্যা-ক্যাল্কুলাস্ নয়, শুধুই ডি-ডিফারেন্শিয়াল! কিন্তু ভা-ভারী ভাবনায় পড়া গেল হে!—তপন চিন্তিত হলো ঃ আওয়াজটা একেবারেই ভালো নয়। চলো, ফিরি।

—এক্ষুনি? এমন শ্যামল প্রান্তর—মাঠে মাঠে এত গোরু—গাছে গাছে এত কাক—এসব ফেলে?

—হ্যাঁ, এসব ফেলেই। ডি-ডি-ডি—ছত্তোর, মানে ওটা ভেঙে গেলে ভারী ল্যাঠায় পড়ব শেষকালে! গাড়ি আর চলবেই না।

আসাম রোড ছেড়ে ডানদিকের একটা নুড়িফেলা রাস্তা দিয়ে চলেছিলুম আমরা—খুব সম্ভব সামনের কোনো চা-বাগানের দিকেই লক্ষ্য ছিল তপনের। সেইখানেই ডিফারেন্শিয়াল-ঘটিত দুর্ঘটনা!

মেঘলা আকাশটি এতক্ষণে আরো মেদুর হয়ে এসেছিল। বেশ ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল এই সময়।

নুড়িফেলা রাস্তাটা একটা প্রায়-শুকনো পাহাড়ী নদীর ভেতর দিয়ে ওপারে চলে গেছে—নদীতে ইঞ্চি-চারেক জলের একটা নীল ক্ষীণ ধারা। নদীর দিকে একটুখানি নেমে গিয়ে গাড়িটা ঘোরাতে চেষ্টা করল তপন। আর ঠিক সেইসময়—কোনো ধারালো নুড়ির সংঘর্ষেই কি না কে জানে—

গুড়ুম!

অর্থাৎ টায়ার ফাটল! ডানদিকে একটু হেলে পড়ে থেমে দাঁড়ালো গাড়িটা।

আমি চিংকার করে বললুম, ইউরেকা! এইটের জন্যেই অপেক্ষা

করছিলুম! 'এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব নাকো আর—'

—কে-কে বলে ফিরব না?—তপন চোখ পাকিয়ে তাকালো আমার দিকে: আলবত ফিরব—পাঁ-পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ফিরব। স্টে-স্টে-স্টে—

—স্টেশন? রেলস্টেশন? সে এখানে কোথায় ভাই?

—আঃ—স্টে-স্টেশন নয়, স্টে-স্টেপ্‌নি! মানে এ-এক্‌স্ট্রা টায়ার। সঙ্গেই আছে। ও-য়েট—এক্ষুনি ঠিক করে নিচ্ছি।

বৃষ্টিটা বেশ চেপে নেমেছে তখন। গোঁ গোঁ করতে করতে তপন তার মধ্যেই বেরিয়ে গেল গাড়ি থেকে।

—জ্যা-জ্যাক্‌টা দাও।

—জ্যাক! সে আবার কে? তাকে কোথায় পাব? সে তো জিলের সঙ্গে পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিল।

—ইয়ার্কি বন্ধ করো সুকুমার। গাড়ির পেছনেই রয়েছে—হ্যাঁ—ওইটে, ওইটে। ওকেই জ্যাক্ বলে। দাও-দাও—ভিজে ভূত হয়ে যাচ্ছি। আর নেমে পড়ো।

নামব?—কাতর হয়ে বললুম, এই বৃষ্টিতে?

—আমি ভিজছিনা বুঝি? তুমি আ-আরামে বসে থাকবে, আর আমি একা ভিজে ঢো-ঢোল হয়ে খে-খেটে মরব? কুইক্-কুইক্ —হেল্‌প মী।

হাঁটুটা গীয়ারের ঘায়ে টনটন করছিল, তবু নেমে পড়তে হলো। তারপর সেই দুর্দান্ত বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে জ্যাক্ বসানো, টায়ার খোলা এবং—

ততক্ষণে শীতে হাড়-পাঁজরা কালিয়ে যাওয়ার জো। কাঁপতে কাঁপতে বললুম, জ্যাকের পালা তো মিটল ভাই, এবার তোমার জিল—মানে টায়ার আনো! এরপরে যে ডবল নিমোনিয়া হয়ে যাবে হে!

—আর দু' মিনিট্—

গাড়ির পেছনে একটা পুরোনো টায়ার শোভাবর্ধন করছিল, তপন টেনে বের করে আনল সেটাকে।

এইবার ধরো এটাকে। ঠিক এখানে-এখানে। আরে, আরে টি-টি-টিউবটা তো—

টিউবটা যে কী ব্যাপার সেটা বোঝবার আগেই কোথা থেকে আট-দশটি প্রাণী আমাদের গায়ে একসঙ্গে লাফিয়ে পড়ল। একটা আমার নাক বেয়ে উঠে, মাথার ওপর দিয়ে বেগে বেরিয়ে গেল, আর একটা ধুতির ভেতর আশ্রয় নিতে চেষ্টা করল। প্রাণপণে লাফিয়ে উঠে পিছল পাথরে আমি ধপাস্ করে আছাড় খেলুম একটা! এবং তারপরেই তারস্বরে চিৎকার ছাড়লুম: হেল্প্—হেল্প—মার্ডার!

—মা-মার্ডার নয়—ইঁদুর-ইঁদুর!—তপন আরো জোরে চেঁচিয়ে উঠল: স্টে-স্টে-স্টেপনিতে বাসা করেছিল। টি-টিউব একদম ঝাঁঝরা! আরে আরে—আমার শার্টের ভেতর একটা ঢু-ঢুকে বসে আছে যে!—তপন নাচতে শুরু করল: কই—যাচ্ছে না তো! একবার এদিক একবার ওদিক—কা-কা-কামড়ালেই তো র‍্যাট্-ফিভার!

আশেপাশে একটি গাছ নেই—পাথরের ওপর আমি বসে আছি কাটা সৈনিকের মতো—তপন তার চোঙা-মার্কা ট্রাউজার পরে শার্টের ভেতর থেকে ইঁদুর তাড়াবার জন্যে প্রাণপণে নেচে চলেছে—মুষলধারায় বৃষ্টির ভেতরেও সেই নয়নলোভন দৃশ্যটা উপভোগ করে আমার মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল।

—গেছে—গেছে—পালিয়েছে!—হঠাৎ একটা জয়ধ্বনি উঠল তপনের: কিন্তু গাড়ির কী হবে ভাই? স্টেপনিটার ভেতরে ইঁদুরের বাসা, অথচ ব্যাটা রামবিলাস কালকেও গাড়ি বেচবার সময় বলেছিল, একদম নয়া টা-টা-টায়ার দে দিয়া বাবুসাব্!

—চুলোয় যাক গাড়ি।—খোঁড়াতে খোঁড়াতে আমি উঠে দাঁড়ালুম: এ বৃষ্টি তো আর সহ্য করা যায় না! চলো, কোথাও একটা শেল্টার—

কথাটা আর শেষ হলো না। তার আগেই অনেক দূর থেকে অদ্ভুত আওয়াজ এল একটা। যেন একপাল বুনো মোষ ছুটে আসছে আমাদের দিকে।

আর তৎক্ষণাৎ চিৎকার করল তপন: পালাও—পালাও সুকুমার। বান আসছে—পাহাড়ী বান।

এক মিনিট—দু মিনিট—আড়াই মিনিট? সেই বৃষ্টির ভেতর, অলিম্পিক রেকর্ড ছাপিয়ে আমরা কতখানি দৌড়ে গেলুম বলতে পারব না। তারপর ফিরে তাকিয়ে দেখলুম শুকনো পাহাড়ী নদীর খাতে অন্তত সাত ফুট উঁচু হয়ে ছুটে এল এক দুরন্ত ফেনার স্রোত—আর—

আর তপনের মোটরগাড়িটা এক মুহূর্তে স্রোতের ধাক্কায় যেন একশো টুকরো হয়ে সেই স্রোতের মধ্যে মিলিয়ে গেল!

কিছুক্ষণ শোকাহত চোখে সেই স্রোতের দিকে চেয়ে রইলুম আমরা। তারপর তপন ধপাস করে একরাশ জলকাদার মধ্যেই বসে পড়ল। তখন অবিশ্যি কাদাজলে আমাদের আর কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না। মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়ছে তখনো।

—পাঁ-পাঁচশো টাকা নগদ দিয়ে কিনেছিলুম গাড়িটা। গেল!

গিয়ে যে ভালোই করল, অন্তত দু-দুটো মানুষকে আরো কিছুদিন পরমায়ু দিয়ে গেল, ইচ্ছে সত্ত্বেও সে-কথাটা আমি তপনকে এই মুহূর্তে কিছুতেই বলতে পারলুম না।



একটি করুণ ফোটোগ্রাফি

তপন ঘরে ঢুকে বললে, শু-শু-শুক—

আমি তৎক্ষণাৎ আপত্তি জানালুম। বললুম, না, আমি শুশুক নই—আমার নাম সুকুমার।

—তোমাকে শু-শুক বললেই ঠিক হয়, যেরকম ম্-ম্ মোটা হচ্ছ দিন দিন! মাসে কত পা-পাউণ্ড করে বাড়ছো হে? পঁ-পঁচিশ?

গম্ভীর হয়ে বললুম, না, দশ পাউণ্ড। কিন্তু তাতে তোমার কী? আমি মোটা হবো—আমার খুশি।

—তা হও—হতেই থাকো। শেষকালে যখন সেই ব্যা-ব্যা ব্যা—

আরো গম্ভীর হয়ে বললুম, বাজে কথা। মোটা হলে কেউ ব্যা-ব্যা করে ডাকে না।

—না, না, ডাকের কথা নয়। সেই ব্যা-ব্যা-ব্যা-অ্যাণ্ডের মতো—সরু গোঁফের তলায় এতক্ষণে সাফল্যের হাসি ফুটল তপনের: যখন ফ-ফটাস করে ফেটে যাবে—

—যাই যাবো। ফেটে যাবো বোমার মতো, বিদীর্ণ হবো ঝঞ্ঝার মতো, বিস্ফোরিত হবো—ভেবে-চিন্তে আর কিছু না পেয়ে একেবারে মোক্ষম কথাটা বললুম, প্রলয়ের মতো। চারদিকের লোক জানতে পারবে, হাঁ, একটা কাণ্ড হলো বটে। তোমার মত শুঁটকে পোকা-দা হয়ে বেঁচে থাকার চাইতে—

তপনের ডাক নাম পোকা—এইটে আমি জেনে ফেলবার পর থেকেই তপন অত্যন্ত নার্ভাস হয়ে আছে। যখনই এসে আমার মোটার নিয়ে যা-তা বলতে শুরু করে, আমি পত্রপাঠ ওই অস্ত্রে ওকে বধ করে ফেলি। তপন বললে, থা-থাক, আর ঝগড়া করে দরকার নেই। [illegible]।

আমি বললুম, আলবৎ। সে-কথাটা আগে বললেই সব মামলা মিটে যেত।

তপন ধপাস করে আমার তক্তাপোশের উপর বসে পড়ল এবং বসেই হাত বাড়িয়ে আবার সিগারেটের প্যাকেটটা দখল করল। আমি ব্যাজার মুখে সেটা দেখলুম। বললুম, তপন, ডাক্তারেরা বলেছেন, সিগারেট খেলে লাং-ক্যানসার হয়।

—তু-তুমি খাও যে?

—নিজের পয়সায় খেলে হয় না। কিন্তু পরস্মৈপদী যদি চালাও, বিশেষ করে বন্ধুর প্যাকেট থেকে—শিয়োর ডেথ।

—ওঃ, তাই নাকি?—সরু গোঁফের তলায় তপন মিটমিট করে হাসল : এ-ও বুঝি ডা-ডাক্তারদের থিয়োরী?

—সার্টেনলি।

তা হলে সেটা প-প-প্রমাণ করে আমিই শহীদ হতে চাই —বলেই একটানে আধখানা সিগারেট নামিয়ে দিলে। অগত্যা দারুণ চটে কিছুক্ষণ আমি চুপ করে রইলুম। তারপর বললুম, এই ছুটির সকালে আমাকে জ্বালাতে এলে যে?

—জ্বালাতে নয়, চালাতে। সিগারেটে টান দিয়ে তপনের বুদ্ধি খুলে গেছে বলে মনে হলো : ওঠো হে সু-সু—

—শুশুক নয়, সুকুমার।

তপন বললে, উঁহু, সিন্ধুঘোটক। চলো।

—কোথায় পোকাদা?

—অল রাইট সু-সুকুমার। হলো, এবার? চলো আর কথা বাড়াতে হবে না।

—কিন্তু কোথায় যেতে হবে? আবার মোটর কিনেছ নাকি?

—পা-পাগল! ও-সব ফুলিশনেসের ভেতরে আমি আর নেই।

—তবে কি সেই পারুল পিসিমার বাড়ি গান শুনতে ?

—রামচন্দ্র !

—তা হলে আবার কি পোলাও রান্না করেছ ? নাকি সেই মিসেস ঘো-ঘোষাল আসছেন ?

—বোকো না !—তপন. একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে আমায় তুলে ফেলল : নাউ—টু অ্যাক্‌শন !

এবং কিসের অ্যাকশন সেটা বোঝবার আগেই হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে এল রাস্তায়।

আমাদের এই শহরের গা ঘেঁষে একটি নদী আছে। একদা স্রোতস্বিনী, কলস্বনা, নটিনী-তটিনী—এইসব ভালো ভালো নামে তাকে ভূষিত করা যেত। অধুনা এটি একটি মজা খাল। ঘন নিবিড় কচুরিপানার ফাঁকে ফাঁকে কালচে জল এবং কয়েক কোটি মিলিয়ন-বিলিয়ন মশার জন্মভূমি! বিকেল চারটে বাজতেই তারা দলবেঁধে জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়ে আর শহরের যাট-সত্তর হাজার মানুষের মাথাপিছু হাজার-পাঁচেক করে জায়গা ভাগ করে নেয় —মাথার ওপর গোল হয়ে ঘুরতে থাকে, অল্পস্বল্প বৃষ্টি হলে গায়ে লাগে না, মশার ঝাঁকেই আটকে যায়।

তপন আমাকে টানতে টানতে সেই নদীর ধারে নিয়ে এল। আর এই বেলা সাড়ে ন'টায় ঝকঝকে রোদের ভেতরেও কয়েকটি মশা দারুণ উৎসাহে আমাদের দিকে অগ্রসর হলো। ঘোর সন্দেহে অভিভূত হয়ে আমি বললুম, তপন এর মানে কী ?

সরু গোঁফের নীচে তপন রহস্যময় হাসল : তোমাকে একটা সা-সারপ্রাইজ দেব।

বললুম, তুমি সর্বদাই আমার কাছে একটা জীবন্ত সারপ্রাইজ, ও-জন্যে বেশি চেষ্টা তোমায় করতে হবে না। এখন ব্যাপারটা সোজাসুজি বলে ফেলো!—এই সাত-সকালে নদী-নামধেয় এই নর্দমার কাছে আমায় টেনে আনলে কী মতলবে ?

—একটা জিনিস আমি কিনেছি। ক্যা-ক্যা-ক্যা—

—ক্যা-ক্যা?—আশ্চর্য হয়ে বললুম: ক্যাট? মানে বেড়াল? বেড়াল কেনবার দরকার কী? পয়সা দিয়ে কি তাদের কিনতে হয়? তারা তো আপনিই এসে জোটে, দলে দলে জোটে এবং তাড়ালেও তো যায় না। তাদের সম্বন্ধেই তো কবি গেয়েছিলেন: 'না চাহিলে যারে পাওয়া যায়, তেয়াগিলে আসে হাতে—'

—তোমার মুণ্ডু!—এতক্ষণে দেখতে পেলুম তপনের কাঁধে একটা কালিম্পংয়ের ঝোলা রয়েছে। সেটা থেকে কী বের করতে করতে তপন বললে, এতে আছে একটা ক্যাম্-ক্যাম্—

—ক্যামেল?—আমি আরো আশ্চর্য হলুম: উট? কাঁধের ঝোলার মধ্যে উট? তুমি কি পি সি সরকার নাকি হে? কিংবা কোথায় যেন পড়েছিলুম—'ছুঁচের ছিদ্র দিয়া উটও গলিয়া যাইতে পারে'—ঝোলাতে থাকবে সে আর বেশি কথা কী?

—তোমার মাথা!—তপন এবার ঝোলা থেকে একটা ক্যামেরা বের করে ফেলল।

—ওঃ, ক্যামেরা! স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আমি ধপাস করে ঘাসের ওপর বসে পড়লুম: ওর জন্যে তুমি আমায় একেবারে নদীর ধারে টেনে আনলে? ব্যাপার কি, চোরাই মাল নাকি?

—চোরাই হবে কেন?—তপন বিকট ভ্রুকুটি করে আমার দিকে তাকালো: আমি কি একটা ক্যা-ক্যামেরা কিনতে পারি না?

—আলবাত পারো। ক্যামেরা, ক্যামেল, সবই কিনতে পারো। কিন্তু আমার জিজ্ঞাস্য এই যে, সেটা ঘরের ভেতরে না দেখিয়ে নদী পর্যন্ত আনতে হলো কেন?

—কারণ এখানেই তোমার ছবি তুলব। বেশ ন্যা-ন্যা-ন্যাচারাল সিনারির ভেতরে।

—আমি আনন্যাচারাল নাকি?

—নিশ্চয়। অমন সি-সিন্ধুঘোটকের মতো মোটা হয়ে—

বাধা দিয়ে গম্ভীর স্বরে বললুম, তা হলে কি পোকার মতো শুঁটকে হবো বলতে চাও ?

তপন ব্যস্ত হয়ে বললে, যেতে দাও—যেতে দাও, লেট ইট গো। মানে, এখানে চারদিকে বেশ ন্যা-ন্যাচারাল বিউটি, এরই ভেতরে তোমার ছবি তুলব। মানে, তোমাকে দিয়েই শুরু করব আর কি !

—আগে বললে না কেন ? বেশ দাড়ি-টাড়ি কামিয়ে স্নো মেখে টিপটপ হয়ে আসতুম।

—না-না, তাতে আর্টিফিশিয়াল হয়ে যেত। এই যে তোমার মুখে খোঁ-খোঁচা খোঁচা দাড়ি রয়েছে, চুল উশকো-খুশকো—তাতে বেশ একটা—ইয়ে—যেন আদিম—

—আদিম মানে ? একটা বর্বরের মতো দেখাচ্ছে—এই তো বলতে চাও ? তীব্র প্রতিবাদ করে বললুম, এক্সকিউজ মী তপন, আমি ছবি তুলতে চাই না।

—আহা, চটে যাচ্ছ কেন ? তুমি তো সাহিত্যিক হে—প্রায়ই দেখি পোস্টঅফিস থেকে তোমার গল্প ফেরত দিয়ে যায়। তপন মিটমিট করে হাসল : মানে এখন তোমার ছবি তুললে ঠিক মনে হবে, এইমাত্র একটা গল্প ফেরত পেয়ে তুমি দা-দা-দারুণ উদাস হয়ে—

—আই সে পোকাদা, আমি ছবি তুলব না।

চলে যাচ্ছিলুম, তপন খপ করে আমার হাত চেপে ধরল : আচ্ছা, আচ্ছা, আই উইথড্র। মানে, এখন ছবি তুললে মনে হবে, তুমি একটা খুব ঘো-ঘো-ঘোরালো প্লট নিয়ে চিন্তা করছ, তাই তোমার মুখে একটা ক-করুণ বিষাদের ছায়া পড়েছে। হলো এবার ?

গোঁজ হয়ে বললুম, হলো। নাও—এবারে কী ছবি তুলবে তোলো।

—না-না, ওভাবে সোজা দাঁড়িয়ে নয়। একটা বেশ লা-লা-লাভলি কম্পোজিশন চাই। মানে একদম নতুন ধরনের।—তপন এদিক-ওদিক তাকালো : দি আইডিয়া! তুমি শুয়ে পড়ো।

—শুয়ে পড়ব?

—হাঁ, এই ঘা-ঘাসের ওপর। শুয়ে শুয়ে ঘা-ঘাস খেতে থাকো।

—শুয়ে শুয়ে ঘাস খেতে থাকব?—আমি চটে গেলুম : কেন ঘাস খেতে থাকব? আমি কি গোরু?

—আঃ, গো-গো-গোরুর মতো ঘাস খেতে কে বলেছে তোমাকে? বেশ কাত হয়ে—আকাশের দিকে তাকিয়ে—একটা ঘা-ঘাসের শিস্ চি-চিবুতে থাকো। যেন আকাশ থেকে একটা ভাব—

আমি খপ করে কথাটা কেড়ে নিয়ে বললুম, ডাবের মতো পেড়ে নিতে চাইছি।

—এগজাকটলি! ঠিক বুঝেছ এবার। হাঁ, শুয়ে পড়ো। না-না, ওদিকে নয়। দেখছ না—সূ-সূর্যটা একেবারে চোখের সামনে জ্বলছে? এ-ধারে—এই পাশটায়—

—কিন্তু এদিকের ঘাসগুলো যে বড্ড নোংরা হে!

তপন আশ্চর্য হলো : নোংরা? ঘা-ঘাস আবার কবে নোংরা হয়? ওরা হলো—কী বলে—ধ-ধ-ধরণীর আনন্দের উচ্ছ্বাস। নাও—কুইক—

অগত্যা আমি ঘাসের ওপরে কাত হলুম। কিন্তু কোত্থেকে পচা গোবরের গন্ধ আসছিল আর এই চড়চড়ে রোদের ভেতরেও তিন-চারটে মশা এসে আমার নাক-বরাবর চড়াও হতে চেষ্টা করছিল। খপ করে আমি একটা মশা মেরে ফেললুম। আর সফলতার শান্ত পুলকে সমস্ত মন আমার ভরে গেল।

—ওকি, নড়ছ কেন? স্টে-স্টেডি হয়ে থাকো।—তপন বেশ কায়দা করে হাঁটুগেড়ে বসে পড়ল : বাঃ—বেশ হয়েছে—নাইস!

কিন্তু ঘা-ঘাসের শিস্ তো চিবুচ্ছ না ?

—এই সকালবেলা আমি ঘাস খেতে পারব না। কিছুতেই নয়। বলো তো বরং আঙুল চুষতে পারি।

—বু-বুড়ো বয়েসে আঙুল চুষবে কি রকম ?—তপন অত্যন্ত বিরক্ত হলো : তার চাইতে আকাশের দিকে ঠায় চেয়ে থাকো। ইয়া, ঠিক হয়েছে। এখন স্পীড আর অ্যাপারচারটা করে নিতে হচ্ছে। ওয়ান ম্-ম্-মিনিট—

—বলেই পকেট থেকে একটা কাগজ বের করে পড়ে যেতে লাগল : ব্লেজিং সান—মর্নিং সান—ক্লাউডি সান—

বিরক্ত হয়ে বললুম, কী হচ্ছে হে ? ঘাসের ভেতর থেকে কী একটা পোকা আমায় কুট-কুট করে কামড়াচ্ছে, কানের কাছে পিনপিন করে মশা ডাকছে। ওদিকে আবার বিচ্ছিরি গোবরের গন্ধ। যা করবে, চটপট করে ফেলো।

—ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? স্‌প—স্‌প—পীড আর অ্যাপারচার ঠিক না হলে কারেক্ট পিক্‌চার হবে কী করে ? তা হলে মর্নিং সান —ক্-ক্-ক্লাউডি সান—

আমি বললুম, মুনি সান, নাইটি সান—

—মুনি সান—নাইটি সান ?—তপন প্রথমটা চমকে গেল। তারপর সামলে নিয়ে বললে, ঠা-ঠাট্টা নয়। সু-সু-সুক্—

—সুকুমার।

—থ্যাঙ্ক ইউ। না, ঠাট্টা নয়। ব্যাপার ভে-ভেরি সিরিয়াস। অল্ রাইট—অ্যাপারচার সিক্সটিন, স্পীড হাণ্ড্রেড—ডি-ডি-ডি-ডিস, মরুক গে, ইনফিনিটি।

—ইনফিনিটি ?—আমি কাতর হয়ে বললুম : অনন্তকাল আমায় এইভাবে শুইয়ে রাখবে নাকি হে ? এদিকে আমি যে পোকার কামড়ে জেরবার হয়ে গেলুম।... ওদিকে আবার মশা—!

—শাট আপ ! স্-স্টেডি ? ওয়ান—টু—থ্রী—ক্লিক্!

—বাঁচালে—বলে যেই তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছি, তপন তারস্বরে চেঁচিয়ে উঠল।

—হয়নি, হয়নি—কিছু হয়নি। এগেন।

—এগেন?—আমি দস্তুরমতো ক্ষেপে গেলুম: এতক্ষণ ঘাসের ওপর আমায় এইভাবে ফেলে রেখে এগেন?

—কী করা যাবে?—তপন দাঁত খিঁচিয়ে বললে: মনেই ছিল না যে, লেনসের ঢা-ঢাকনাটা খোলাই হয়নি। নাও, আবার শুয়ে পড়ো।

জামা ঝাড়তে ঝাড়তে আমি বললুম, অসম্ভব। ঘাসের ভেতরে শুয়ে অনন্তকাল পোকার কামড় খাব, এমন পোকাদা আমাকে পাওনি। আমি এবার চললুম, টা—টা—

বলেই বেগে প্রস্থান করবার চেষ্টা করলুম, কিন্তু তপন খপ করে আমাকে জাপটে ধরল।

—আহা, চটে যাচ্ছ কেন? ভু-ভুল তো মানুষের হয়েই থাকে।

—তুমি অতি থার্ডক্লাস ফোটোগ্রাফার।

সরু গোঁফের নীচে আবার সেই মনোরম হাসি হেসে তপন বললে, হাত পাকাতে পাকাতেই ফা-ফার্স্ট ক্লাস হয়ে উঠব।

—কিন্তু আমার ওপর কেন? সামনে কচুরিপানা রয়েছে, মাঠে এনতার গোরু-ছাগল চরছে—যত ইচ্ছে হাত পাকাও। আমাকে আর জ্বালিয়োনা।

—আচ্ছা-আচ্ছা, অ্যানাদার চান্স।

—আমি শুতে পারব না। ইম্‌পসিবল! আর ধরাশায়ী করতে পারছ না আমাকে।

—তবে দাঁ-দাঁড়িয়েই থাকো! না-না ওভাবে নয়।—কিছুক্ষণ চারদিক পর্যবেক্ষণ করে বললে, ঠিক হয়েছে। এই ক-ক-কদম গাছটায় হেলান দিয়ে দাঁড়াও।

—কদম গাছে হেলান দিয়ে? একদম কেষ্ট ঠাকুরের মতো?

—একদম।

আমি বললুম, তা হলে একটা মুরলী দরকার। আর ইয়ে —একটুখানি কেশে নিয়ে বললুম, পাশে যদি, মানে বুঝতেই পারছ, ইয়ে যদি শ্রীরাধা না থাকে—

তপন দাঁত খিঁচিয়ে বললে, সির্-সির্ -সির্—মরুক গে—রাধা! ওই তো সিন্-সিন্-সিন্ধুঘোটকের মতো তোমার চেহারা, আবার রাধা! একটা কুঁ-কুঁ-কুঁজী-টুজী হলে বরং মানাত!

—কী! আমার ছবি নেবে আবার আমারই চেহারাকে অপমান করবে! তুলব না।

—আচ্ছা, পিস্—মানে সন্ধি। মেনে নিলুম তোমার চেহারা একেবারে ক-কন্দর্পের মতো। তা রাধা যখন এখানে নেই, মুরলীও আনা হয়নি, তখন তুমি একাই দাঁড়াও। তোমার রূপেই সব আলো হয়ে যাবে। আঃ, যাও না! বেলা বেড়ে যাচ্ছে এরপর আর ভালো ছবি হবে না।

অগত্যা হাসি হাসি মুখ করে কদম গাছে হেলান দিয়ে আমি দাঁড়ালুম। মনে মনে ভাবতে চেষ্টা করলুম, আমিই সেই নওল কিশোর, শ্রীমতী এখুনি আমার পাশে এসে হাজির হবেন। আর তপন পকেট থেকে সেই কাগজের টুকরোটা বের করে হিসেব করতে লাগল: ব্রেজিং সান—ক্লাউডি সান—

আমি বললুম, মুনি সান—

—উঁহু, মুনি সান হয় না। হুঁ, শেডি জায়গা—মানে ছায়া রয়েছে। অ্যাপারচার তা হলে সি-সি-সি—

বললুম, ছি-ছি-ছি—

—না, ছি-ছি-নয়, সি-সিক্সিক্—মানে ষোলো। স্-স্-স্-পীড পঞ্চাশ—ডি-ডি-ডিস—চুলোয় যাক—দশ ফিট!—ক্যামেরা ঠিক করতে করতে তপন বললে, রেডি? ওয়ান-টু—

কিন্তু থ্রী বলবার আগেই আমি লাফ মারলুম একটা—প্রচণ্ড

লাফ! আর লাফিয়েই ব্যাপারটা শেষ হলো না, তারপরে আমি নাচতে লাগলুম—ঘুরে ঘুরেই নাচতে লাগলুম! সেটা রুম্বা না, না ফক্সট্রট, না হুলাহুলা কে জানে!

তপন বললে, এই-মরেছে! আরে নাচ্ছ কেন? ছবি নেব কী করে? থামো-থামো!

কিন্তু থামতে চাইলেই কি থামা যায়? রাধা-কেষ্টর কারবারই আলাদা—ওঁদের অসাধ্য কাজ নেই, কিন্তু আমার পক্ষে কদম্বমূলে দাঁড়ানো যে কী মারাত্মক ব্যাপার সে আমি মর্মে মর্মে—অর্থাৎ চর্মে চর্মেই টের পাচ্ছিলুম। কদম গাছতলায় লাল পিপঁড়ের বাসা ছিল।

—উঃ গেলুম যে! বাপস—কী পিঁপড়ে! প্রাণপণে পা চুলকোতে চুলকোতে আমি দাপিয়ে চললুম : ইস্—এই পোকাদার পাল্লায় পড়ে—উস্—কী জোর কামড়াচ্ছে! ইঃ—কী ডেঞ্জারাস্!

আনন্দে আকর্ণ হাসি হাসল তপন।

—বললুম ঘা-ঘাসে শুয়ে পড়ো, সেটা তো তোমার ভালো লাগল না। এখন—

—শাট্ আপ! ইউ মার্ডারার, তোমাকে আমি খুন করব!

জ্বলুনি থামল দশ মিনিট পরে। তখন আমি বিধ্বস্ত হয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়েছি। আর একটা স্বর্গীয় হাসিতে তপনের সমস্ত মুখ ভরে উঠেছে।

—এইবারে ঠিক হয়েছে। এতক্ষণ ধরে যে পোজটা আনতে চাইছিলুম—এগজাক্ট এসে গেছে তোমার মুখে। একটা ব্যা-ব্যা-ব্যথাভরা বিরহ, একটা কা-কাতর ধুসরতা—একটা নিবিড় আবেগ, একটা প-প-পরাজিত হাহাকার—

ইচ্ছে করল, উঠে একটা চড় বসিয়ে দিই ওকে—কিন্তু এতক্ষণ নাচানাচি করে আমি বেদম হয়ে গিয়েছিলুম। কেবল চোখ পাকিয়ে প্যাট-প্যাট করে চেয়ে রইলুম ওর দিকে।

সরু গোঁফে একটুখানি তা দিয়ে তপন বললে, ভ-ভ-ভগবান আছেন। যা চাইছিলুম—একদম সেই জিনিস! যা একখানা ফোটো হবে—মার্ভেলাস!—ক্যামেরা নিয়ে পিছু হটতে হটতে তপন বলে চলল: একটা বি-বি—বিরহ, একটা বু-বু-বুকফাটা হাহাকার—একটা—

উত্তরে আমি ঘোঁৎ করলুম।

—আহা, চটো কেন? খুব ন্যা-ন্যা-ন্যাচারাল ছবি হবে। এইবার—হুঁ—পকেট থেকে আবার কাগজের টুকরো বেরুল: ব-ব-ব্লেজিং সান—উঁহু, ঠিক তা নয়—আচ্ছা, অ্যাপারচার এগারো, স্-স্-পীড—ওয়ান হাণ্ড্রেড—

তপন এক-পা এক-পা করে পিছু হটতে লাগল, আর আমিও পিঁপড়ের কামড় ভুলে গিয়ে একটু একটু করে কৌতূহলী হয়ে উঠতে লাগলুম। আমার অবচেতন মন খুশী হয়ে বলতে লাগল: এতক্ষণে একটা ইন্‌টারেস্টিং ব্যাপার নির্ঘাত ঘটতে যাচ্ছে।

তপন বললে, হাসো তো একটু?

—হাসব?

—হ্যাঁ। কদম গাছে হেলান দিয়ে যে-রকম হাসছিলে—তপন মিট মিট করে হাসল: ওই রকম একটুখানি হাসলেই হবে। একটা রি-রি-রিক্ততার তিক্ত হাসি, একটা—ক্যামেরা ঠিক করতে করতে তপন কিছু হটে চলল: একটা ধূসর হা-হা-হা—

এবং তৎক্ষণাৎ অ্যাক্-ক্—ঝপাস্' করে একটা শব্দ হলো, আর আমি পরমানন্দে বললুম: হাঃ—হাঃ—হাঃ—

তপন ঠিকই বলেছিল, ভ-ভগবান আছেন। তা—তিনি ছিলেন, খুব কাছাকাছি ছিলেন। তপন ক্যামেরা ঠিক করতে করতে পিছু হটছিল, একটু একটু করে সরে যাচ্ছিল মজা নদীর কিনারার দিকে, এতক্ষণে আমার মুখে রিক্ততার একটা ধূসর হাহাকার দেখতে পেয়ে কোনো দিকে তার লক্ষ্য ছিল না—

আর আমি দেখছিলুম এবং ভ-ভ-ভগবান দেখছিলেন !

মজা নদীর দুর্গন্ধ কালোজল তোলপাড় করে তপন ওঠবার চেষ্টা করছে। গায়ে মাথায় কচুরিপানা, নর্দমা-ব্র্যাণ্ড ট্রাউজার কাদা মেখে একাকার, উঠতে গিয়ে বার বার পা পিছলে যাচ্ছে —রিয়্যাল হাহাকার যাকে বলে !

হাজার হোক, বন্ধু তো ! হাত বাড়িয়ে এক হ্যাঁচকা টানে আমি ওকে ডাঙায় তুলে ফেললুম।

তপন হাউ হাউ করতে করতে বললে, আমার ক্যা-ক্যা-ক্যা—

আমি বললুম, ক্যামেল ?

—না, মেরা। মেরা ক্যামেরা—হাউ হাউ করতে করতে তপন বলে চলল: জলে পড়ে গেছে—ব্র্যা-ব্র্যা-ব্র্যাণ্ড নিউ—তুলতে পারলুম না—

—ধীরে সুস্থে তোলা যাবে—ভাবনা কী। আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললুম, ততক্ষণ আণ্ডারওয়াটার ফোটোগ্রাফি চলতে থাকুক, তুমিও বাঁচো, আমিও বাঁচি !



তপনের চৌরচর্চা

তিন সপ্তাহ ছুটির পরে, ব্যাঙ্কে ফিরে এসে আমার ঘোরতর সন্দেহ হলো যে, তপনের একটা কিছু পরিবর্তন ঘটেছে।

না—চেহারায় কিছুই বদলায় নি। সেই চোঙামার্কা প্যাণ্ট, সেই সরু গোঁফ, সেই খাড়া খাড়া চুল। হৃদয়ঘটিতও কিছু নয়, মানে প্রেমে পড়েছে কিংবা বিয়ের কথা চলেছে এ-রকমও মনে হলো না। তা হলে তো বেশ ভাবুকের মতো দেখাত, উদাসভাবে চেয়ে-টেয়েও থাকত, ক্যাব্‌লা-ক্যাব্‌লা হয়ে যেত। আমি স্পষ্ট দেখলুম, চোখে ধূর্ততা, মুখে সেই মিটমিটে গা-জ্বালানো হাসি। প্রেমে পড়লে কিংবা বিয়ের ব্যাপার হলে ওরকম ধড়ীবাজের মতো দেখায় না কাউকে।

বরং আমাকে এসে সম্ভাষণ করে বললে, 'তুমি যে-রকম মোটা হচ্ছ সু-সু-সুক—'

বললুম, 'আমি মোটেই শুশুক নই—আমার নাম সুকুমার।'

—'না—সু-সু-সুকুমার নয় বরং সু-কু-কুমড়ো বলা যায়। নইলে একটা হিপ-হিপ—'

আমি বললুম, 'হিপ-হিপ—হুর্‌র‍্যা!'

সরু গোঁফের নীচে তপনের মিচকে হাসি আরো ধূর্ত হয়ে উঠল: 'না—না, হুর্‌র‍্যা নয়। হিপ-হিপ-পটে—

'পট্যাটো?'

'তার চেয়েও খারাপ। হিপ-হিপো-পটেমাস!'

'বটে, আমি জলহস্তী?'—চটে গিয়ে বললুম, 'তিন সপ্তাহ পরে ফিরেছি, কোথায় কুশল-টুশল নেবে, তার বদলে জলহস্তী বলা হল আমাকে? আর তুমি কী? তোমার নাম পোকাদা নয়?"

পোকাদা—এই নামটা শুনলেই নার্ভাস হয়ে যায় তপন। হাড়-জ্বালানো হাসিটা বন্ধ হলো তক্ষুনি।

'ডোন্‌ট সে পোকাদা—ওটা আমার নাম নয়, ব-বদনাম। ছে-ছে-ছেলেবেলায় একটা পোকা ধরে খেয়েছিলুম, তারপর থেকে—'

'নিশ্চয় বেশ বড়ো সাইজের, কালো—ভোঁ-ভোঁ শব্দে উলটে-পড়া একটা গুবরে পোকা ধরে খেয়েছিলে। তোমার মতো বাজে লোক এর চাইতে বেটার পোকা খেতেই পারে না।'

রেগে তপন আরো তোতলা হয়ে গেল।

'আর তু-তু-তুমি? নিশ্চয়—ক্-ক্-কোলা ব্যাঙ খেয়েছিলে একটা। তাই হি-হি-হি-হিপ—মরুক্‌গে—এইরকম মো-মো-মো-মোটা হয়ে যাচ্ছ। শেষে একদিন ফ-ফ-ফটাশ করে ফেটে যাবে।'

বলে—গোঁ গোঁ করতে করতে নিজের কাউণ্টারে চলে গেল।

এ-জাতীয় সদালাপ আমাদের সর্বদাই হয়ে থাকে, এমন কিছু নতুন কথা নয়। কিন্তু সন্ধের পরেও যখন তপন আমার বাসায় এল না, তখন আমার সন্দেহ আরো ঘনীভূত হতে থাকল। এ-রকম তো হওয়ার কথা নয়। আমি বাসায় থাকব—অথচ তপন আসবে না—এসে আমার পুরো এক প্যাকেট সিগারেট ধ্বংস করে যাবে না, ত্ব' ঘণ্টা বক বক করে আমার মাথা ধরিয়ে দেবে না, এমন অঘটন ঘটতেই পারে না।

সাড়ে আটটা বাজল—তবু তার পাত্তা নেই। সিনেমা দেখতে গেল? তা-ও অসম্ভব, কারণ আমি এখানে থাকলে নিজের পয়সায় সিনেমা দেখবে এমন পাত্রই সে নয়। আর কাউকে ম্যানেজ করেছে? তা-ও হতে পারে না—আমার এমন মোটা ঘাড় থাকতে আর কারো স্কন্ধারূঢ় হবে সে, আর কেউ ঘাড় পেতে দেবে তার জন্যে—দ্বিতীয় কোনো এহেন নির্বোধ ব্যক্তি এই ধুরন্ধর শহরে আছে বলে জানা নেই আমার। তা ছাড়া—ইংরিজি, বাংলা যে-কোনো সিনেমাই হোক ছবি আরম্ভ হতে না হতেই—তপন কানের কাছে সমানে ফিসফিস করে, সম্পূর্ণ অযাচিতভাবেই গল্পটার ব্যাখ্যা করতে থাকে। আমি—অদূরের হিমালয়ের মতোই অনন্ত ধৈর্যে তা সহ্য করে যাই, আর কেউ হলে থাপ্পড় মেরে পাশ থেকে উঠিয়ে

দেবে তপনকে।

না—এসব নয়, ব্যাপার আরো সিরীয়াস। শেক্সপীয়রের ভাষায় ডেনমার্ক রাজ্যে একটা গোলমাল আছে কোথাও!

বসে বসে তপনের প্রতীক্ষায় 'হবসন-জবসন' করবার কোনো মানে হয় না—একবার নিজেকেই যেতে হচ্ছে তা হলে। মহম্মদ যদি পর্বতের (তপনের মতে আমি ক্রমে গিরি-গোবর্ধন হয়ে উঠছি—যদিচ আমার লেটেস্ট ওজন দু'মণের বেশি নয়) কাছে না আসেন, তা হলে পর্বতকেই মহম্মদের কাছে যেতে হয়। অগত্যা কাতরভাবে বেরিয়ে পড়তে হলো আমাকেই।

হুঁ—বাড়িতেই আছে। নইলে, আধখোলা একটা জানালার খড়খড়ি দিয়ে আলো দেখা যেত না। কারণ, পৈতৃক বাড়ি আপাতত তপনের একলারই অধিকারে—তার মা-বাবা বছরখানেক ধরে শিলিগুড়িতে রয়েছেন বড়ো ছেলের কাছে। আর তপনের মেজদা পাকাপাকি দিল্লীর বাসিন্দা।

কিন্তু বৈশাখের এমন মনোহর সন্ধ্যায়—যখন চারদিকে এ-রকম উতরোল হাওয়া এবং সামনের আমবাগানের অসংখ্য চিড়বিড়ে পোকা সেই হাওয়ায় উড়ন্ত—তখন সে হাওয়া এবং পোকাকে ঘরে ঢুকতে না দিয়ে এভাবে পোকাদার জানলা বন্ধ করে রাখবার মানে কী? সন্দেহজনক—ঘোর সন্দেহজনক। এই তিন সপ্তাহের মধ্যে তপন ক্রিমিন্যাল হয়ে গেল নাকি? রোজগার বাড়াবার জন্যে বোমা তৈরীর কটেজ ইনডাস্ট্রিতে মন দেয় নি তো? কিংবা নোট জালই করছে হয় তো? যে লোকের অমন বদখত চোঙা প্যাণ্ট এবং যে অমন বাজে রকমের তোতলা—তার অসাধ্য কিছুই নেই বলেই আমার ধারণা। নইলে বনমুরগী মারতে গিয়ে পোষা মুরগী মেরে দেয়, মাছধোয়া জল দিয়ে পায়েস রেঁধে খাওয়াতে চায় এবং 'অয়েল মাস্ক' পরে, একটা ভয়ঙ্কর মোটরগাড়ী কিনে নিজের এবং বন্ধুর প্রাণনাশের চেষ্টা করে, মিসেস ঘোষালকে অভ্যর্থনা করছে

গিয়ে ঘোলের হাঁড়ির মতো উল্টে দেয় তাঁকে ?

দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একবার ভাবলুম—পুলিসে খবর দেব নাকি ? বোমা কিংবা জাল নোটসুদ্ধু ধরেই নিয়েই যাক ওকে। কিন্তু আমার মোটা শরীরের ভেতরে একটা রোগা-পট্‌কা বিবেক হঠাৎ চ্যাঁ-ভ্যাঁ করে উঠল। আহা, হাজার হোক—বন্ধু তো। এক সঙ্গে কলেজেও তো পড়েছিলো। অন্তত একটা চান্‌স্‌ দাও ওকে।

অতএব, একটা চান্‌স্‌ই দেয়া যাক। দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আমি ডাকলুম : 'তপন !'

সেকেণ্ড তিনেক চুপ। কানের কাছে চৈত্রের হাওয়া, কিছু পোকা এবং ক'টা মশা ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই। তারপর আচমকা—আমাকে ঘাবড়ে দিয়ে ভেতর থেকে একেবারে সেন্ট্রি মার্কা চ্যালেঞ্জ : 'হু কাম্‌স দেয়ার ?'

হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। নিঃসন্দেহেই তপন। কিন্তু হঠাৎ এরকম সম্ভাষণের মানে কী ?

সামলে নিয়ে বললুম, 'ফ্রেণ্ড।'

ভেতর থেকে আবার চড়া গলায় জিজ্ঞাসা : 'হোয়ট্‌ ফ্রেণ্ড ?'

এ তো আচ্ছা ফ্যাচাঙে ফেলল। হোয়ট্‌ ফ্রেণ্ডের মানে কী ? এতক্ষণে সন্দেহের ওপর কিঞ্চিৎ আলো পড়ল আমার। নিশ্চয় গাঁজা খাচ্ছে দরজা-জানালা বন্ধ করে। গাঁজায় দম না দিলে হতেই পারে না এরকম। আমি মাথা চুলকে বললুম, 'এ ফ্রেণ্ড ইন নীড।'

'হোয়ট ?'

গাঁজাখোরের নিকুচি করেছে ! গর্জন করে বললুম, 'বুজুম ফ্রেণ্ড ! হলো এবার ? দরজা খোলো বলছি। আমাকে সমানে মশায় কামড়াচ্ছে—আর ইয়ার্কি হচ্ছে ঘরে বসে ?'

এতক্ষণে ভেতর থেকে খিকখিক করে মিচকে মার্কা হাসিটা

শুনতে পাওয়া গেল।

'বুঝেছি। সু-সু-শুক্—'

'শুশুক নই, সুকুমার।'

'হিপ হিপ—'

'হুররা্যা।'—এবার আমি আরো জোরে, গর্জন করে বললুম, 'লুক হিয়ার পোকাদা, যদি এক মিনিটের মধ্যে দরজা না খোলো, আমি পুলিসে খবর দেব।'

খুট করে ভেতর থেকে ছিটকিনি খোলার আওয়াজ এল একটা। তারপর তপন বললে 'সরি' গলা চিনতে পারিনি। দরজা ভেজানোই আছে—ঠে-ঠেলে ঢুকে পড়ো।'

গলা চিনতে পারোনি—চালিয়াতির জায়গা পায়নি আর! অতি বিখ্যাত আমার গলার আওয়াজ—এক এবং অদ্বিতীয়—সেই গলায় একবার সঙ্গীত প্রচেষ্টা শুনে আমার এক রসিক আত্মীয় পালটা দু'লাইন গান শুনিয়েছিলেন আমায়: 'তোমার কণ্ঠস্বরে, কোকিলের পুচ্ছ ঝরে!' সেই গলা চিনতে পারল না! ধড়ীবাজ আর কাকে বলে!

একটা ঘোর জিঘাংসা নিয়ে আমি দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকতে গেলুম, এবং তৎক্ষণাৎ—

এবং তৎক্ষণাৎ—কোনো রোমহর্ষক গোয়েন্দা গল্পের মতো আমাকে অভিষিক্ত করে দিয়ে—কোন্ শূন্য থেকে ছড়ছড় করে একরাশ জল! আমি লাফিয়ে উঠলুম, তারপরেই পায়ের তলায় মেজেতে একটা দারুণ গতিশীলতা অনুভব করা গেল এবং দু মন শরীরে ভূমিকম্প জাগিয়ে সবেগে ধরাশায়ী হতে হলো আমাকে। আর কানে এল তপনের খিক-খিক হাসি: এক্স্-এক্স্ পে-পে—মরুকগে, সা-সাক্সেস্ফুল!'

সব ব্যাপারটা সামলে নিয়ে ধাতস্থ হতে প্রায় মিনিট দশেক সময় গেল আমার। তপন আমার ভিজে জামাটা খুলে নিয়েছে,

আমার এই জগদ্দল বপুকে—কী মন্ত্রে জানি না—তুলে একটা চেয়ারেও বসিয়ে দিয়েছে।

মাথার ওপর বন বন করে পাখা ঘুরছিল, তাতেই আমার কানের ভোঁ ভোঁ শান্ত হলো একটুখানি। এবং চোখ খুলেই দেখলুম সামনে তপনের শ্রীমুখ। এবার আর মিচকে হাসি নয়—পরম পুলকে বত্রিশটা দাঁতই বেরিয়ে রয়েছে তার।

আর সেই বিকশিত হাসি দিয়েই আমাকে অভ্যর্থনা করল সে।

'এক্স্—একস্‌পে—পেরিমেণ্ট সা-সা-সাকসেস্‌ফুল।'

'কিসের একস্‌পেরিমেণ্ট?'—সেই দুর্ধর্ষ আছাড় খেয়ে কোমর টনটন করছিল, তাই তখনো আমি নিদারুণ ক্রুদ্ধ হতে পারলুম না: 'আমাকে মার্ডার করবার?'

'না। চো—চো—'

'চোপরাও!'

'চো-চোর ধরবার।'

'আমি চোর?'—কোমরের ব্যথাটা অত জাঁদরেল না হলে আমি লাফিয়ে উঠে তপনের টুঁটি চেপে ধরতুম।

'টে-টেক ইট ঈজি স্কুমার—' এক্স্‌পেরিমেণ্টের আনন্দে এবার আর শুশুক বলল না—বরং বেশ আদর করেই আমার কাঁধে হাত রাখল: "কফি খাবে এক পেয়ালা? তা হলে তৈ-তৈ-তৈ—'

'হ্যাং ইয়োর কফি।'—আমি জিঘাংসু চোখে ওর দিকে তাকালুম: কিসের আনন্দে তুমি 'তা-তা থৈ-থৈ করছ হে? কে চোর? কোথায় চোর? নরহত্যা করবার এই রকম বিটকেল প্ল্যানের মানে কী?'

'তা হলে সব খু-খুলে বলছি—' আমার মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে পড়ে তপন বললে, 'চারদিকে তা-তাকিয়ে ছাখো একবার।'

দেখলুম এবং সমস্ত রাগ ভুলে গিয়ে প্রথমে বিহ্বল, তারপরে বিমূঢ়, আরও পরে স্তম্ভিত হলুম আমি।

যে দরজায় পা দিয়েই আমার অপঘাত তার মাথার ওপরে দড়ি বাঁধা একটা বিরাট ঘটি উবুড় হয়ে আছে, সেইটেই আমার সর্বাঙ্গ শীতল জলে অভিষিক্ত করিয়ে দিয়েছিল ; দরজার সামনে একরাশ—না কলা নয়, কলার খোসা (কলাগুলো অবধারিতভাবেই তপন খেয়েছে)—তাতে পা দিয়েই আমি ধরাশায়ী হয়েছিলুম। ছিটকিনির সঙ্গে আবার এক জোড়া চামচে ঝুলছে। ঘরের তিনটে বন্ধ জানলার নীচে কতকগুলো মেটে হাঁড়ি উপুড় করা—তাদের পাশে আবার সেই কলার খোসা। এই জানলাগুলোতেও দড়িবাঁধা কতগুলো কাঁটা চামচে ঝোলানো হয়েছে। আর একটা জানলার মাথায় জালিকাটা একটা থলের মতো কী যেন লেপটেও রয়েছে। তপনের বিছানার ওপরে আবার একটা এয়ার-গানও দেখতে পেলুম আমি।

কিছুক্ষণ মুগ্ধ চোখে এইসব দেখে আমি বললুম : 'লুম্বিনি।'

'লু-লু—লুম—মরুক গে—মানে কী ওর ?'

'সরল বাংলা ভাষায় পাগলা গারদ। কিন্তু তোমাকে বেঁধে রাখবার কেউ নেই এখানে ?'

'ঠা-ঠাট্টা নয় সুকুমার লে-লে-লেট মী একসপ্লে—প্লে'

অতঃপর তপনের সেই ভাষ্য। সেই তোতলামির কণ্টকারণ্য আর বিস্তার করতে চাই না—মোটামুটি ব্যাপারটা এই :

শহরে দিন পনেরো ধরে ছিঁচকে চোরের অত্যন্ত উপদ্রব বেড়েছে। এর বাক্স, তার জামা-কাপড়, অমুকের বাসন, নিদেন পক্ষে তমুকের গাড়ু—যা পাচ্ছে তাই লোপাট। এদিকে তপন একেবারে বাড়িতে একা। তার ওপর কী বলে ইয়ে—তার ঘুমটাও একটু নিবিড়। তাই অনেক ভেবে-চিন্তে এইসব প্রোটেকশান নিতে হয়েছে। সন্ধ্যের পরে দরজা-জানালা এইভাবে সে রেডি

করে রাখে। তাই আর বেরুনো হয় না বাড়ি থেকে।

—অর্থাৎ—চোর যদি ছিটকিনি কেটে ঢুকতে চায়—চামচে-গুলোতে সংঘাত লেগে প্রথমে টিনটিন করে ওয়ার্নিং বাজবে; তারপর দরজা যদি খুলেই ফেলে—ওপারে ঝুলছে এক ঘটি জল—তপনের আবিষ্কৃত অটোম্যাটিক সিসটেমে সেটা উল্‌টে গিয়ে জল ঢালবে চোরের মাথায়; চোর হকচকিয়ে গেলেই কলার খোসা—শিয়োর সাক্‌সেস—আমিই তার প্রমাণ।

এই পর্যন্ত বলেই তপন—আমার ব্রহ্মরন্ধ্রে জ্বালা ধরিয়ে সেই মিচকে মার্কা হাসি হেসে বললে, 'আমি ঠিক বুঝেছিলুম—তোমার ওখানে যদি সন্ধ্যেবেলা না যাই, তুমিই ঠিক চলে আসবে। এবং তারপর—'

তারপরই বটে!

আমি ঘোর রবে বললুম, 'ইডিয়ট।'

'ইডিয়ট? সা—সা—সায়েন্টিফিক ব্রেন।'

'সায়েন্টিফিক ব্রেন! তা হলে একবার আই-এসসি ফেল করেছিলে কেন?'

'ফরগেট ছ্যাট! এখন এই জা-জা-জানলাগুলো—'

কোমরের ব্যথা ভুলে আমি দাঁড়িয়ে পড়লুম: 'চুলোয় যাক তোমার জানলা। আমি বাসায় চললুম। আই টেল ইউ পোকাদা, তুমি সবচেয়ে বাজে পোকা খেয়েছিলে, একটা ম্যাগনাম গুব্‌রে পোকা। জীবনে আমি যদি আর কখনো তোমার মুখদর্শন করি তো—'

'আহা—চ-চটে যাচ্ছ কেন?'—তপন আবার আমাকে চেপে বসিয়ে দিলে চেয়ারে: 'এবার জা-জানালাগুলো। লেট মী—এ-এ-এক্‌স্—'

আবার সেই তোতলামির কাঁটাবন।

তা থেকে জানা গেল: জানলাতেও একই সিস্টেম—ছিটকিনি

খুললেই কাঁটা-চামচের ওয়ার্নিং। তবু চোর ঢুকে পড়লে হুড়মুড় করে মেটে হাঁড়ি ভাঙবার আওয়াজ—কী বলে, তপনের ঘুম—মানে যা একটু প্রগাঢ়—সেটা তো তাতে ভাঙবেই, পাড়ার লোকেরও লাফিয়ে ওঠার সম্ভাবনা। আর কলার খোসা তো আছেই। শিয়োর সাকসেস।

আমি ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বললুম, 'কাঁকে। তোমার যথাস্থান!'

'নো কাঁকে।' তপন ব্যাজার হয়ে বললে, আমি কাঁকে দেখেছি। এ ভে-ভেরী ব্যাড প্লেস। সেখানে যাবার কোনো দ-দ-দরকার নেই আমার। নাউ—হ্য-হ্যাভ ইয়ু সীন দিস এয়ারগান?'

অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে এবার আমাকে একটু কৌতূহলী বোধ করতে হলো।

'এয়ার গানের কর্ক দিয়ে চোর মারবে নাকি?'

'নো-নো—আমি কি গাধা?'

'গাধা তোমার চেয়ে অনেক রেসপেকটেবল। গাধাকে অপমান করবার কোনো রাইট নেই তোমার। তুমি একটি ম্যাগনাম গুবরে পোকা!'

'শা-শা-শাট আপ। আচ্ছা—ওই দিকে—ওই জা-জা-জানলার মাথায় গোল খোপ-খোপ ওটা দেখতে পাচ্ছ কি?'

'হুঁ—দেখছি। কী ওটা? থলে নাকি? গাঁজার কল্‌কে-টল্‌কে ওতেই রাখো বোধ হয়?'

'নট থ-থলে স্যার—নো গাঁজা-বিজনেস—ওটা যাকে বলে—নে-নেচারস গিফট। প-প-প্র—'

'আর কষ্ট করতে হবে না—' আমি বিদ্রূপ করে বললুম: 'প্রকৃতির অবদান।'

'কারেকট। প-পর-পর—মরুক গে অবদান। কী ওটা জানো? বো-বোলতার চাক।'

'অ্যাঁ?'

'হ্যাঁ। আমি তো অফিস করি—আড্ডা ফা-ফা-দিয়ে বেড়াই, খে-খে-খেয়ালই করিনি। বাড়ি ফিরেই কু-কুকার খুলে আহার এবং ঘু-ঘুম। (আমি ব্র্যাকেটে বললুম, 'তুমি একটি ঘুঘু।') ওই জা-জানালাটা কোণের দিকে বলে খো-খোলাই হয় না। একদিন বো-বো-বোলতার ডাক শুনে দেখি—ওখানে ইয়া বড়া এক চাক বানিয়েছে। ভে-ভেঙে ফেলব ভাবছি, এমন সময় 'চো-চোরের' হাঙ্গাম। তখন ভাবলুম—শা-শা—'

'গালাগাল দিচ্ছ নাকি হে?'

'না—না—শাপে বর। ত-তবু যদি চো-চোর ঢুকেই যায়—দ-দম করে এয়ার গানের এক গু-গুলি চালাব চাকে। ব্যস—বোঁ-বোঁ করে বেরিয়ে চো-চোরকে একেবারে—'

'আর তোমাকে ছেড়ে দেবে বোধ হয়? খাতির আছে বুঝি?'

তপনের সরু গোঁফের নীচে আবার একটুখানি উদ্ভাসিত হাসি ফুটে বেরুল: 'আমি কি অতই বো-কা নাকি? রা-রাত্তিরে পায়ের কাছে একটা মোটা কম্‌কম্‌—'

'কমবখ্‌ত!'

'মানে কী?'

'মানে হতচ্ছাড়া। হয় লুম্বিনি, নয় কাঁকে।'

'নো-নট লুম—লুম—নট কাঁকে। ভে-ভেরী ব্যাড প্লেসেস। আমি একটা মোটা কম-কম-কম্বল মুড়ি দিয়ে—'

'চুলোয় যাও।'

তপনের সব ক'টি দাঁত আবার বিকশিত হলো: 'চ-চটে যাচ্ছ কেন? এ-এ-এক্‌স্‌—মরুক গে—মানে সা-সা-সাক্‌সেস্‌ফুল। তুমিই প্র-প্র—'

'প্র-পরা-অপ—'

'নো স্যাং—স্যাং—স্যাংসক্রীট গ্রা-গ্রামার। তুমিই প্র-প্রমাণ

করে দিয়েছ। আমি ভে-ভেরী হ্যাপী।'

কী করব, ব্রহ্মতেজ নেই, নইলে রাস্কেলকে আমি ভস্মীভূত করে ফেলতুম। কিছুক্ষণ অগ্নিদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললুম, 'আমি আছাড় খেয়েছি বলে তুমি খুব হ্যাপী—না ?'

'অ-অফকোর্স'—চোখ দুটো ধূর্ততায় মিটমিট করতে লাগল তপনের: 'একেবারে ধ-ধড়াম্ করে কো-কোলা ব্যাঙের মতো—র‍্যাদার—হা-হাতির বাচ্চার মতো প-পড়ে গেলে! লা-লাভলি! ক্যামেরাটা থাকলে ছ-ছবি তুলে নিতুম। কোথায় লাগে ল-লরেল-হার্ডি!'—খুশিতে তপন যেন গুলগুল করতে লাগল: 'আই সে—হিপ-হিপ-পটেটো—ট-টমাস—একটা জা-জানলাও একটু ট্-ট্-ট্রাই করবে ?'

খুব হয়েছে—আর নয়! উটের পিঠে শেষ খড় যাকে বলে! কোমরের ব্যথা নিদারুণ জিঘাংসায় বিলীন হয়ে গেল আমার।

লাফিয়ে উঠে—এয়ার-গানটা ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বললুম 'তোমার মতো ট্রেটর বন্ধুকে আমি খুন করব—এই এয়ারগান দিয়েই গুলি করব!'

'আহা-হা—পী-পী—প্লীজ—শু-শু-শুক—'

তপন এয়ার-গানটা কেড়ে নিতে চাইল। এবং—এবং দ্রাম!

টানাটানিতে অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ। কর্ক গিয়ে লাগল সোজা বোলতার চাকে। তীরবেগে বেরিয়ে এল হলুদ বর্ণের ডোরা-কাটা একদল প্রাণী—ঘরের জোরালো ইলেকট্রিক আলোয় তারা দিবা-লোকের মতোই দেখতে পাচ্ছে আমাদের। শত্রু পরিষ্কার তাদের সামনে।

'আমার কম্‌কম্—!'

কিন্তু কোথায় কম্বল? হাতের কাছে সে কম্‌বখত তখন রেডি ছিল না। দরকারের সময় কবেই বা থাকে ?

আমার আগে তপনই দরজার দিকে দৌড় মারল। এবং তারই

কলার খোসা। তারা এবারেও চোরকে চিৎ করল, অর্থাৎ তপন নিজে পড়ল, আমাকেও আর একবার তার সংঘাতে ভূপাতিত করল। সেই শিয়োর সাকসেস—নির্ঘাত!

কিন্তু ঘর ভরে তখন জেট-প্লেনের মতো আওয়াজ। যৌথ-পতনের সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের যৌথ উত্থান—একেবারে বিদ্যুদ্বেগে। তারপর আমবাগানের মধ্য দিয়ে টেনে দৌড়।

'চ-চলো—সু-সু-সুকুমার, তোমার বা-বাসাতেই রাতটা কা-কা—'

হাঁপানির মধ্যে কা-কা ধ্বনি হারিয়ে গেল তার।

কিন্তু দরজা যে খোলা রইল—যদি চোর ঢুকে—এই ফাঁকে—'

'যা-যা-যাকগে। চু-চুলোয় যাক চো—চো'

বলতে বলতো চোঁ-চোঁ শব্দে—লম্বা লম্বা ঠ্যাঙে—আমাকে ছাড়িয়ে ক্লীন পঞ্চাশ গজ বেরিয়ে গেল!